১০ মার্চ ২০১৩

রবি

শিল্প ও সাহিত্যে ধর্ষণ

গল্প

বিনোদ ঘোষাল ■ মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

ধারাবাহিক

স্বাতী গুহ ■ ঋতব্রত ভট্টাচার্য

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

SWAMI VIVEKANADA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE

An ISO 9001:2008 Certified Institute NAAC Applied
Approved by A.I.C.T.E & Affiliated to W.B.U.T

'The Sky is not the limit'- that is how we see our venture in Swami Vivekananda Institute of Management and Computer science. Life is moving too fast at a great speed to conquer every field of studies. We at SVIMCS have been striving to help the students, Dream the impossible dream.

COURSE OFFERED

MBA (2 yrs. Full Time)
Specialisation in :
SYSTEMS ▸ HR
FINANCE ▸ MARKETING

Eligibility Criteria :
Graduates and Students who have appeared for final year Graduation and who have cleared MAT will be eligible to enroll.
Students will have to clear GD/PI

"Special features"

- Highly Qualified Faculties
- Orientation Programmes
- Book Bank Facility
- AC Classroom
- Separate Hostel For Boys & Girls
- Free Laptop
- 120hrs Consultant mode SAP
- Certificate course on Retail Management
- Certificate course on Safety Management
- Certificate course on Communication Skill

An extremely active and effective placement cell. We are proud of quoting names of

INDUSTRY ASSOCIATION

The Statesman ▪ L&T Finance ▪ Reliance Communication ▪ Godrej ▪ Manikaran Power ▪ Ganga Motors ▪ ICICI Bank ▪ Cadila Pharmaceuticals ▪ Keynote Wealth Management ▪ Karvy ▪ MPS Foods ▪ Mindscape ▪ Indian Oil Corporation Ltd. ▪ Tata Steel ▪ Simplex Infrastructure ▪ Mother Diary ▪ Mahindra 2 wheelers ▪ Lord Realty ▪ IMRB ▪ ION Exchange (I) Ltd ▪ Anagram - Eldeswiss ▪ ING VYSYA ▪ Aviva ▪ Indian Overseas Bank and many more...

SWAMI VIVEKANANDA INSTITUTE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE
Sonarpur | Karbala Station Road | P.O. Narendrapur | P.S. Sonarpur | Kolkata - 700103 | Ph. No. 2428 3035
Mob : 9831031999, 9831004445, 9831084446 | Website : www.svist.org; www.svimcs.org | Email : infor@svist.org | Fax. 2437 9913

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

১০ মার্চ ২০১৩ । বর্ষ ২ । সংখ্যা ৫

প্রচ্ছদ ৫

শিল্প ও সাহিত্যে ধর্ষণ

রোম নগরীর ভাস্কর্য থেকে এই বাংলার সাহিত্যে কীভাবে বারবার নারী নিগ্রহ, পুরুষ ও নারীর একটি কঠোর বাস্তব সম্পর্ক নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে। লিখছেন—

শাওনী চক্রবর্তী ও রাহুল দাশগুপ্ত

গল্প-১ ১৮

লাস্ট ট্রেনে একটি পরি
বিনোদ ঘোষাল

গল্প-২ ২৪

বৈশাখী ঝড়
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

কবিতা ৩৬
প্রবালকুমার বসু, পলাশ দে, সুকান্ত মণ্ডল, শ্রীদর্শনী চক্রবর্তী, শুভ্রনীল সাগর

ধারাবাহিক ২৯

বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

নভেলেট ৩৮

চিহ্ন
স্বাতী গুহ

নিয়মিত বিভাগ
আলোচনা ৪৩
উদাসী বাবার আখড়া ৪৪
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়
আরব্য রজনী ৪৮
রোজ কত কী ৫০
সুব্রত সেন

প্রচ্ছদের ছবি: জিয়ান লরেনজো বারনিনি

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** । সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

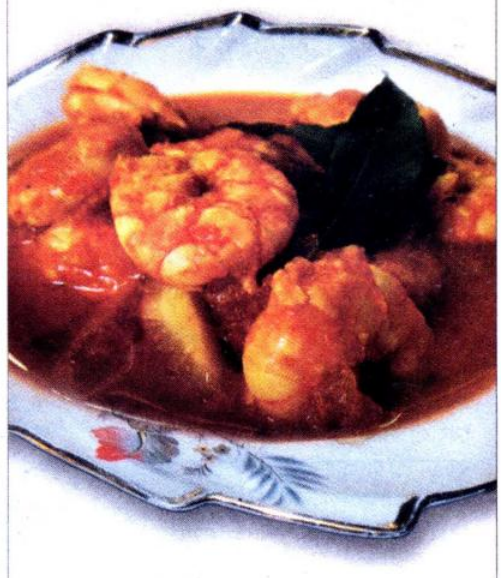

গোটা মশলার স্বাদ
এখন গুঁড়ো মশলায়

রান্নার আসল আস্বাদ পেতে এখন আর গোটা মশলার প্রয়োজন নেই। টেস্ট মী গুঁড়ো মশলা তৈরী বাছাই করা খাঁটি মশলা দিয়ে যা প্রতিটি রান্নায় নিয়ে আসে লাজবাব্ টেস্ট। আপনার কিচেনে নিয়ে আসুন টেস্ট মী আর দেখুন রসনায় কিভাবে আসে জাদুর ছোঁয়া।

Taste me..
গুঁড়ো মশলা

A product of
Rose Valley™
Happiness Unlimited
Corporate Office: Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5, Block - DP
Sector - V, Kolkata - 700 091
Ph.: 033 - 4025 4025, 4025 4444, 4025 4000
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries, call: +91 91633 24060

megaminds.in

বাংলার বাউল, লাউ ও মার্গসঙ্গীতের কথা

মার্গসঙ্গীতের দিকপাল সদ্যপ্রয়াত রবিশঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েত খাঁ, যশস্বী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যেভাবে তাঁদের সৃজনশীলতায় এই গ্রাম্য লাউয়ের ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর।

জগৎ সংসার বিমুখ, চালচুলোহীন বাউল সম্প্রদায় বৈরাগ্য সাধন প্রকৃত মুক্তির পথ বলে মনে করেন। বাংলার পথে প্রান্তরে আজও বাউলদের দেখা মেলে। তাঁদের সঙ্গী হয় সাধের লাউ। আজ্ঞাতপরিচয় বাউলের উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'। সেই লোকগীতিতে লাউ নামক মধুর ফলের অশেষ গুণের বর্ণনা রয়েছে।

আজও শুধু প্রাত্যহিক জীবনে লাউয়ের ব্যবহার নেই, সঙ্গীত জগতের নানা ক্ষেত্রে তার সদর্প উপস্থিতি রয়েছে। লাউ শুধু যে বাউলের সাথী নয়, প্রথিতযশা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীদেরও একান্ত আপনজন, তা 'রবি'র আবরণ কথায় (১৭ ফেব্রুয়ারি) জানতে পেরে সমৃদ্ধ হলাম। মার্গসঙ্গীতের দিকপাল সদ্যপ্রয়াত রবিশঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েত খাঁ, যশস্বী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যেভাবে তাঁদের সৃজনশীলতায় এই গ্রাম্য লাউয়ের ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। তাই আউল-বাউলের বাউলাউ আজ বিশ্বজনীন বাদ্যযন্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

শুকুর আলি, চাকুন্দি। হুগলি।

মৌষলকাল এক অনবদ্য বাস্তবধর্মী উপন্যাস

১০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় শেষ হয়ে গেল সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক উপন্যাস 'মৌষলকাল'। সময় ও কালের পটচিত্রের এক অনবদ্য উপন্যাস। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম রবির এই উপন্যাসটি পড়ার জন্য। ধন্যবাদ লেখককে, অভিনন্দন রবির সম্পাদককে এমন একটি সময়ের দলিল যুক্ত বাস্তবধর্মী উপন্যাস উপহার দেবার জন্য। সমাজ ও সংসারের চলমান ঘটনাবলিকে সুন্দর করে তুলে ধরার যে গুরুদায়িত্ব লেখকরা কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা 'মৌষলকাল' পড়লেই বোঝা যায়। 'রবি' পত্রিকাটি ক্রমশই সাহিত্যের এক সম্পদ হয়ে উঠছে। এটি যেন বন্ধ না হয়। 'রবি' সম্পাদককে অভিনন্দন সহ।

দেবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগপাড়, বাঁকুড়া।

লা জবাব অম্লমধুর 'রোজ কত কী'

নিয়মিত কলম 'রোজ কত কী' নিঃসন্দেহে 'রবি'-র অন্যতম সেরা আকর্ষণ। চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সুব্রত সেন মহাশয়ের অম্লমধুর এই প্রতিবেদন আমার কাছে এককথায় 'লা জবাব'। গত একবছর ধরে তার একাধিক প্রতিবেদনে কৈশোর ও যৌবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি আরও একবার ফিরে পাচ্ছি।

আমাদের মানতেই হবে সুব্রতবাবুর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার একমাত্র বিশ্ববরেণ্য জাদুকর পি সি সরকারের 'ওয়াটার অব ইন্ডিয়া' ম্যাজিকের সঙ্গেই তুলনীয়।

পরিশেষে একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে একটি ছোট্ট আক্ষেপ—'রবি'-র কাছে কিন্তু ক্রীড়াপ্রেমীরা ভীষণভাবেই বঞ্চিত হচ্ছে। অন্তত দুটি পাতা ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য রাখা হোক।

অমিতকুমার কর। জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

দিন শেষ একচেটিয়া সাহিত্যগিরির

পত্র-পত্রিকার বর্তমান খোলা বাজারে একটি নির্দিষ্ট পত্রিকার একচেটিয়া কর্তৃত্বের যুগ শেষ। একটি বিশেষ পত্রিকাগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের সাহিত্য-গিরির এতদিনে অবসান হল বলাই যায়। যার খুবই প্রয়োজন ছিল। তারা পাঠককে যা ভালো-মন্দ পড়তে দিয়ে আসছে এতদিন ধরে তাই সাহিত্য, তারা পাঠককে যে লেখক-কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসছে তারাই কেবলমাত্র কবি-লেখক—এই অসুস্থ পরিস্থিতি আজ প্রায় আর নেই বলা চলে। তার কারণ সংবাদপত্র আর পত্র-পত্রিকার সংখ্যা আজ আগের চেয়ে অনেক বেশি; এবং প্রত্যেকেই নিজেদের রুচি ও সাধ্যমতো কাজ করছেন। খবর ৩৬৫ দিন-এর রবিবারের আয়োজন 'রবি'ও এই নতুন যুগের এক সারথি. প্রচ্ছদ নিবন্ধ, গল্প,, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস, কলাম, গ্রন্থ আলোচনা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে 'রবি' নিজের মতো করে একটি সম্পূর্ণ পত্রিকা। ল্যাডলী মুখোপাধ্যায় ও সুব্রত সেনের লেখার আমি ফ্যান। তা ছাড়া গল্প-কবিতাও নজরে রাখে। বলা যায় না কোন সময় নতুন কবির কিংবা নতুন এক গদ্যকারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যাকে কেন্দ্র করে আগামী বাংলা সাহিত্যে রূপরেখা নির্দিষ্ট হবে। আমার বিশ্বাস আজকের পত্র-পত্রিকার এই খোলা-মেলার যুগে জন্মালে অমিয়ভূষণ, সন্দীপন, কমলকুমাররাও নিয়মিত বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলিতে লিখতেন। এবং আরও বেশি পাঠকের সঙ্গে তাঁদের, তাঁদের সঙ্গে আরও বেশি পাঠকের পরিচয় হত।

অভিজিৎ রায়। সোনারপুর।

ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি-শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে তা হল, একজন অসহায় নারী, যার শরীরে যৌন অত্যাচার করেছে এক বা একাধিক পুরুষ। নারীর প্রতি পুরুষের এই যৌননিগ্রহ আজকের নয়, দীর্ঘকালের জাতি-ধর্ম-স্থান-কাল নির্বিশেষে ধর্ষণ ছিল ধর্ষণ আছে। পুরুষের এই আদিম জান্তব প্রবৃত্তি সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে পারেনি, তার নিদর্শন আমরা পাচ্ছি আকছার। অথচ এই ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য প্রক্রিয়াকে পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতে মহান রূপে প্রচার করার চেষ্টা চলেছে। দেশ-বিদেশের শিল্পে-সাহিত্যে বার-বার এসেছে ধর্ষণের প্রসঙ্গ। কেন? সেই উত্তর খোঁজা নয়, রবি বরং খুঁজে দেখল সুদূর রোম নগরীর ভাস্কর্য থেকে এই বাংলার সাহিত্যে কী ভাবে বারবার নারী নিগ্রহ, পুরুষ ও নারীর একটি কঠোর বাস্তব সম্পর্ক নির্মমভাবে ফুটে উঠেছে।

ছিন্ন কুসুম

‘ধর্ষণ’ শব্দটিকে ডি-কোড করতে গেলে কেবলমাত্র শরীরের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আলোচনা করলে চলে না। সেখানে ক্ষমতা, আধিপত্য, রাষ্ট্রের মতো ব্যাপকতর ক্ষেত্রগুলোও জড়িয়ে যায়।

শাওনী চক্রবর্তী

ছিন্ন কুসুমের রূপকথা

সনাতন রেনেশাঁ শিল্প-স্থাপত্য রীতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাচার। আর কয়েকদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে বারক পর্ব। সে সময় হঠাৎ করেই হই চই ফেলে ছিল একটা ভাস্কর্য—'রেপ অফ স্যাবাইনা উত্তম্যান'। শিল্পী জিয়াম বোলোগনা, ভাস্কর হিসেবে বোলোগনার নামডাক ছিল আগে থেকেই, কিন্তু তাঁর এই সৃষ্টিটি রীতিমতো আলোড়ন ফেলে ছিল রোমান শিল্পীমহলে।

ধর্ষণ' শব্দটি নিছক কোনও একমাত্রিক শব্দ নয়। এটি একটি ত্রিমাত্রিক শব্দ। শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক পুরুষের জিঘাংসু মুখ। কানে আসে এক নারীর যোনি ফাটা আর্তনাদ। উচ্চারণের মুহূর্তেই এমন দৃশ্যকল্প তৈরি করার ক্ষমতা খুব কম শব্দেরই আছে। তবে খুব অদ্ভুতভাবেই এই দৃশ্যকল্প আমূল বদলে যায়, যখন শব্দটা স্রেফ মুখে বলার পর্যায় থেকে বেরিয়ে শিল্পের দরবারে প্রবেশ করে। ধর্ষণ একটি শারীরিক ঘটনা। কিন্তু যখনই সেটা শিল্প বা স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা রাজনীতি, সমাজনীতি দ্বারা বিনির্মিত হয়ে আসে। সেটা আর কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টার ঘটনা বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে না, তার পরতে পরতে জড়িয়ে যায় ইতিহাস। অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে 'ধর্ষণ' শব্দটিকে ডি-কোড করতে গেলে কেবলমাত্র শরীরের প্রেক্ষাপটকে নিয়ে আলোচনা করলে চলে না। সেখানে ক্ষমতা, আধিপত্য, রাষ্ট্রের মতো ব্যাপকতর ক্ষেত্রগুলোও জড়িয়ে যায়, অথচ এখানেও চলে একটা উলটপুরাণের খেলা। চিরকাল ধরেই দেখা গিয়েছে শিল্প স্থাপত্যের নির্মাণটা শরীরমুখী। মাধ্যমটা এক্সপ্রেশন, ইম্প্রেশন ইত্যাদি যাই হোক না কেন, বাস্তব বা পরাবাস্তবের আধারে শেষপর্যন্ত মানব শরীরের অবয়বটাকে ধরার চেষ্টা করা হয়। অথবা ধর্ষণের মত একটা তুমুল শারীরিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই শরীরটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। নারী-পুরুষের শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘটনার পিছনের উৎসটাকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়। যার পরিনামে আমরা পাই আধিপত্য, পৌরুষ, রাষ্ট্রক্ষমতার ধারাবিবরণী ফ্রান্সিসকো গোইয়া'র 'দ্য ডিসাস্টার্স আওয়ার' চিত্রমালা, অবশ্য এটা তো গন্তব্যের প্রায় শেষের একটা মোড়। শুরুটা তো হয়েছিল সেই সব শুরুর লগ্নে প্রথম আলোতেই।

তখন সাবেক রেনেশাঁ প্রায় শেষের পথে। সনাতন রেনেশাঁ শিল্প-স্থাপত্য রীতির মধ্যে ঢুকে পড়ছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাচার। আর কয়েকদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে বারক পর্ব। সে সময় হঠাৎ করেই হই চই ফেলে ছিল একটা ভাস্কর্য—'রেপ অফ স্যাবাইনা উত্তম্যান'। শিল্পী জিয়াম বোলোগনা, ভাস্কর হিসেবে বোলোগনার নামডাক ছিল আগে থেকেই, কিন্তু তাঁর এই সৃষ্টিটি রীতিমতো আলোড়ন ফেলে ছিল রোমান শিল্পীমহলে, কারণ, ভাস্কর্যটিতে রোমের ইতিহাসের একটা প্রায় ভুলে যাওয়া অধ্যায়কে তুলে আনলেন, মনে হতেই পারে, এ আর এমন কী? রেনেশাঁ পর্বে তো এটা হামেশাই হয়েছে। বা বলা উচিত এটাই তো হয়েছে। তাহলে কোথায় আলাদা হলেন বোলোগনা?

বোলোগনা আলাদা হলেন, কারণ অন্যদের মতো রোমান বা গ্রেকো-রোমান ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কোনও গৌরবময় অধ্যায়কে তুলে আনলেন যা রোমের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত লজ্জাজনক অধ্যায়। অথচ ইতিহাসে সেই লজ্জাজনক অধ্যায়কে গৌরবান্বিত করার কম চেষ্টা হয়নি। স্যাবাইনাকাণ্ডে দায়ী পুরুষদের 'হিরোয়িক রেপিস্ট' বা ধর্ষক নায়ক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। রোমুলাস সবে তৈরি করছেন রোম। সে সময় রোমের মুল ভূখণ্ডের প্রকৃত

রেপ অব প্রসপেরিনা

জেকব স্টারদা

অধিবাসী ছিল স্যাবাইনরা। আগন্তুক রোমানদের স্বাভাবিকভাবেই ভালো চোখে দেখেনি তারা। রোমানরা যাতে কোনও জনপদ গড়তে না পারে, সে জন্য বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তারা। তার মধ্যে একটি ছিল নিজেদের জনগোষ্ঠির মেয়েদের সঙ্গে রোমানদের বিবাহ দেওয়া হবে না। এর শোধ তুলতে স্যাবইনদের নেপচুন ইতুয়েস্টার উৎসবের দিনে রোমুলাসের নির্দেশে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রোমানরা। গায়ের জোরে লুঠ করে আনে স্যাবাইনার মেয়েদের। শুধু তাই নয়, এর পর রোমুলাস ঘোষণা করেন লুঠ করে আনা মেয়েরা শস্য আর অস্ত্রের মতোই রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ফলে যে কেউ যে কোনও সময় তাদের ভোগ করতে পারে, পরবর্তীকালে এই ঘটনার ইতিহাস রচনার দায়িত্ব পড়েছিল রোমানদের হাতেই, ফল যা হওয়ার তাই হল। সাম্রাজ্যবাদীর হাতে লেখা ইতিহাসের বয়ানে ধর্ষক হয়ে গেল নায়ক। আর ধর্ষণকে ব্যাখ্যা করা হল রাষ্ট্রের জন্মের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ষণ প্রক্রিয়া হিসাবে। প্রায় ১৭০০ বছর পর ঘটনাটিকে ছেনি-হাতুড়ির ছন্দে মূর্ত করে তুললেন বোলোগনা। একটা নারকীয় ঘটনাকে প্রয়োজনের মোড়কে মুড়ে ন্যায্য বানানোর যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটাকে নিয়ে এলেন প্রকাশ্যে। রেনেশাঁ যে আর খুব বেশিদিন নেই, তা বোঝা গেল স্পষ্টভাবেই। কারণ রেনেশাঁর শুরুর দিকে মানুষের কথা বলার হলেও তার জন্য একটা তৈরি মোড়ক দরকার হয়ে পড়ছিল। দেবদেবীদের লাইসেন্স নিয়ে নিজেদের মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই ব্যাপারটাকে একেবারে ভেঙে দিলেন বোলোগনা। 'রেপ অফ স্যাবাইনা উওম্যান'-এর হাত ধরেই শুরু হল অন্ত-রেনেশাঁ পর্বে ম্যানারিজম আন্দোলন।

রেপ অব দি স্যাবাইনা ওমেন

‘রেপ অফ স্যাবাইনা উওম্যান’ নিয়ে বোলোগনার পরও পিয়েত্রো দে বোর্তোনা, নিকোলাস পুসিন প্রমুখ শিল্পীদের বিখ্যাত সব শিল্পকীর্তি রয়েছে। এই সব ছবিগুলিতেও কোথাও সরাসরি নারীর যৌননিগ্রহের চিত্র দেখানো হয়নি, অপহরণের ছবিই আঁকা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে হয়। সেটা হল, ‘রেপ’ শব্দটাকে এখন আমরা ‘ধর্ষণ’ বলে চিহ্নিত করলেও লাতিন ভাষায় এর অর্থটা কিন্তু ছিল আলাদা। লাতিন ‘রেপশিয়া’ শব্দের অর্থ হল ‘গণ অপহরণ’। মূলত একাধিক নারীকে অপহরণের ঘটনাকে বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটে। শুধু অপহরণ না, অবমাননা অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকে ‘রেপ’। সেই অবমাননা যৌননিগ্রহ নাও হতে পারে। এর সব থেকে বড় উদাহরণ আলেকজান্ডার পোপের ‘দ্য রেপ অফ দ্য লক’ (১৭১২)। এখানে পুরুষটি নারীটির একগোছা চুল ছিঁড়ে নিয়েছে। এই ঘটনাকে ‘রেপ’ বলছেন কবি। অর্থাৎ যে কোনও ধরনের সম্ভোগকে ‘রেপ’ বলা হয়েছে। বস্তুত ‘রেপ’ শব্দটির অর্থ একাধিকবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের পেনাল কোড অনুযায়ী বার বার বদলে গিয়েছে ‘রেপ’-এর সংজ্ঞা। সাম্প্রতিককালে দিল্লি গণধর্ষণের ঘটনার পর ভার্মা কমিশন দেশের ধর্ষণ আইন সংশোধনের যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানেও দেখা গিয়েছে নারীর যে কোনও অবমাননাকেই ধর্ষণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, ফিরে আসি প্রসঙ্গে। ‘রেপ অফ স্যাবাইনা উওম্যান’ নিয়ে বোলোগনার পরও পিয়েত্রো দে বোর্তোনা, নিকোলাস পুসিন প্রমুখ শিল্পীদের বিখ্যাত সব শিল্পকীর্তি রয়েছে। এই সব ছবিগুলিতেও কোথাও সরাসরি নারীর যৌননিগ্রহের চিত্র দেখানো হয়নি, অপহরণের ছবিই আঁকা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য তিশিয়ানের ‘রেপ অফ ইউরোপা’। গ্রিক মহাকাব্যের চরিত্র ইউরোপার নামেই ইউরোপ মহাদেশের নামকরণ করা হয়েছিল। সুন্দরী ইউরোপাকে সাদা ষাঁড়ের ছদ্মবেশে অপহরণ করেন জিউস। পৃথিবীর দৈত্যকন্যা ইউরোপার গর্ভে দৈবী ঔরস দান করেই নাকি ইউরোপের বীজ বুনেছিলেন জিউস। ফলে আরও একবার, সেই রাষ্ট্রের জন্মের মতো এক মহান ইতিহাসের তলায় চাপা পড়ে গেল নারীর অবমাননা। ‘ধর্ষণ’ হয়ে গেল পবিত্র কর্তব্যের নামান্তর।

তিশিয়ানের আর একটি শিল্পকীর্তি ‘জেকোপো স্ত্রাদা’ (১৫৬৭ খ্রিঃ)। না, এটি কোনও ধর্ষণের ছবি নয়। ছবিটি এক রাজপুরুষের। বিশালদেহী সেই রাজপুরুষ লাল পোশাকের ওপর কালো জোব্বা পরে বসে রয়েছেন। প্রায় ঐশ্বরিক উপস্থিতি তাঁর। কিন্তু ছবির আসল চমকটা হল, তাঁর দু’হাতে ধরা রয়েছে একটি নগ্ন নারীদেহ। আকারে সেটি খুব ছোট, একেবারে পুতুলের মতো তার স্তন দুটিকে বেড় দিয়ে রয়েছে রাজপুরুষের আঙুলগুলো। আর এভাবেই প্রকাশ্য ধর্ষণ না হয়েও, ধর্ষণের ও পৌরুষের আস্ফালনের এক প্রকাশ্য দলিল হয়ে উঠেছে ছবিটি। ১৫৪৫ সালে ইতালির ভাস্কর বেনভেনুতো পেল্লিনি গ্রিক মহাকাব্যের একটি সর্বজনবিদিত কাহিনিকে পাথরে রূপ দিলেন। পার্সিউস চরিত্রটির নামেই হল ভাস্কর্যটির নাম—‘পার্সিউস’। ভাস্কর্যটিতে দেখা গেল নগ্নদেহী পার্সিউস দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর এক হাত খড়্গ, অন্য হাতে মেডুসার ছিন্ন মস্তক। পায়ের কাছে লুটিয়ে রয়েছে নগ্ন মেডুসার কবন্ধ শরীর। মূর্তির সব থেকে উল্লেখযোগ্য জায়গা দুটি। এক, পার্সিউসের খড়্গের অবস্থান। দুই, মেডুসার শরীর। পার্সিউসের খড়্গটি তার ঝোলানো হাতের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে অবস্থান করছে। একেবারে তার উদ্যত লিঙ্গের সমান্তরালে। খড়্গের আকারও সাধারণ নয়। গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্যে পুরুষের লিঙ্গের মাথাটা যেভাবে বক্র করে দেখানো হয়েছে বার বার, ঠিক তেমনভাবেই পার্সিউসের খড়্গের মাথাটিও সামান্য বেঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খড়্গটি হয়ে উঠেছে পার্সিউসের লিঙ্গ, তার পৌরুষের দ্যোতক। অন্যদিকে স্খলিতবসনা মেডুসার স্তন দুটি উদ্যত। তার সদ্যমৃত শরীরে প্রাক-মৃত্যু যৌন উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। পুরোণে কোথাও মেডুসা ও পার্সিউসের শারীরিক মিলন বা ধর্ষণের কথা বলা নেই। কিন্তু পেল্লিনির ভাস্কর্যে তার ছাপ রয়ে গিয়েছে। মৃত্যু ও ধর্ষণ একাকার হয়ে গিয়েছে সেখানে। এর কারণ কী? কাহিনিতে দেখা যায়, মেডুসাকে হত্যা করে পার্সিউস। আবার মেডুসার সেই কাটা মাথাই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তার সহায় হয়েছে। এমন কী প্রেয়সী আন্দ্রোমেডাকে হাসিল করার সময়ও মেডুসার মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধে জিতেছে সে। এই বিষয়টিকেই শিল্পকীর্তির মূলধন করেছেন পেল্লিনি। সত্যিই তো, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পার্সিউসের মেডুসা বধকে স্রেফ একটি ডাইনি হত্যা বলে ছেড়ে দেওয়া যায় কি? বরং বলা যায়, এক নারীকে হত্যা করে, তারই সহায়তায় এগিয়ে যাচ্ছে এক পুরুষ। পুরুষের হত্যাকামিতা, বহুগামিতা, ক্ষমতার আধিপত্যকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পেল্লিনি।

ধর্ষণ গৌরবান্বিত হয়েছে বারবার। ধ্রুপদী সাহিত্য, মহাকাব্যে, ধর্ষণ কখনওই ধর্ষণ হয়ে ওঠেনি, বরং বার বারই তাদের ঘিরে রেখেছে পৌরুষের বিজয়ডঙ্কা। বারবারই সমাজের প্রয়োজনে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ধর্ষিত হয়েছেন নারীরা। আর এই প্রয়োজন নামের ভণ্ডামিটাকেই বার বার ফাঁস করে দিয়েছে শিল্পকীর্তিগুলো। এই সমস্ত ভাস্কর্য, শিল্পকলা তৈরি হয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকে অবলম্বন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর কোনও একটি ঘটনা হয়ে থাকেনি, ইতিহাসের এক একটি অধ্যায় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময় পর্বের এই শিল্পকীর্তিগুলো যে ইতিহাসকে তুলে ধরেছে, একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, দেশ-কাল-ভূখণ্ডের নির্বিশেষে আধিপত্যের

রেপ অব ইউরোপা, শিল্পী: রেমব্রাঁ

বয়ানটা কিন্তু বিশেষ বদলায়নি। সেই তিনটি বৈশিষ্ট্য—১. সামন্ততন্ত্রকে ও পৌরুষকে একই ক্ষমতার অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা। ২. রাষ্ট্র পরিচালনা হোক বা উৎপাদন ব্যবস্থা, নারীকে পুরোপুরি ব্রাত্য করে রাখা। ৩. একমাত্র যৌন বিনোদন ও প্রজন্ম-জন্ম যন্ত্র হিসেবে নারীকে ব্যবহার, ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার।

প্রাচীন প্যাগান ঐতিহ্যেও নারীরা সৃষ্টিযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত। কিন্তু সেখানে নারীর উন্মুক্ত স্তন, তা থেকে বেরিয়ে আসা দুগ্ধধারার একটা কল্যাণময় ব্যাঞ্জনা ছিল। সমস্যাটা শুরু হল, যখন সেই স্তনের ওপর সভ্যতার দোহাই দিয়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল কাঁচুলি। এক আলো-হাওয়াময় মুক্ত যৌনতার জায়গা দখল করে নিল যৌনলালসা, পৌরুষের আস্ফালন। জন্ম নিল 'ধর্ষণ'। এই পরিবর্তনের জায়গাটাকেই বারবার ধরতে চেয়েছেন শিল্পীরা। আর এর সন্ধান রেনেশাঁ পর্বে শুরু হওয়ারও একটা কারণ ছিল। এ সময় খ্রিস্টিয় ঐতিহ্যের একটা আড়মোড়া ভাঙার পর্ব চলছিল। ক্যাথলিসিজমের দমবন্ধ করা কারাগার থেকে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিতে চাইছে প্রোটেস্ট্যান্টরা। ক্যাথলিসিজমের পবিত্রতার বাড়াবাড়িতে চাপা পড়ে গিয়েছিল একটা সত্য। খ্রিস্ট ধর্মের প্রাণপুরুষ, ঈশ্বর পুত্র যিশুর জন্মটা যে বৈধতার স্ট্যাম্প মারা নয়, সেই সত্যিটাকে বারবার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিল ক্যাথলিকরা। প্রোটেস্ট্যান্টদের যাত্রাটা কিন্তু শুরু হল সেখান থেকেই। ঈশ্বরপুত্রের কুমারী মাতাকে সমাদরে বরণ করলেন তারা। আর সেই পথ ধরেই মাথা উঁচু করে জগতের আলো দেখল মেডুসা, ইউরোপা বা স্যাবাইনার হতভাগিনীরা।

ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের ধারায় যন্ত্রণা এক ধরনের সৃজনশীলতার বিষয়। এই সৃজনশীলতা শুধুই সৌন্দর্য নিয়ে কাজ করে না, বরং তার উৎস সন্ধান করে। এই একুশ শতকে এসে তাই উমবের্তো ইকোকে সন্দর্ভ রচনা করতে হয় 'অন আগলিনেস' নামে। এর ভিতরেই বোধ হয় লুকিয়ে থাকে যন্ত্রণার সেই পাপকুসুম চয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। নিছক সৌন্দর্যের প্রথাগত অন্বেষণ নয়, বরং যন্ত্রণা ভেদ করে উঠে আসা এক ধরনের শিল্পরূপ। পরিভাষায় যাকে বলে প্রোটেস্ক, তার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো বিচার করা যেতে পারে এইসব শিল্পকে। যা এক অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক হয়েও আন্ডারগ্রাউন্ডের শিল্প। ❖

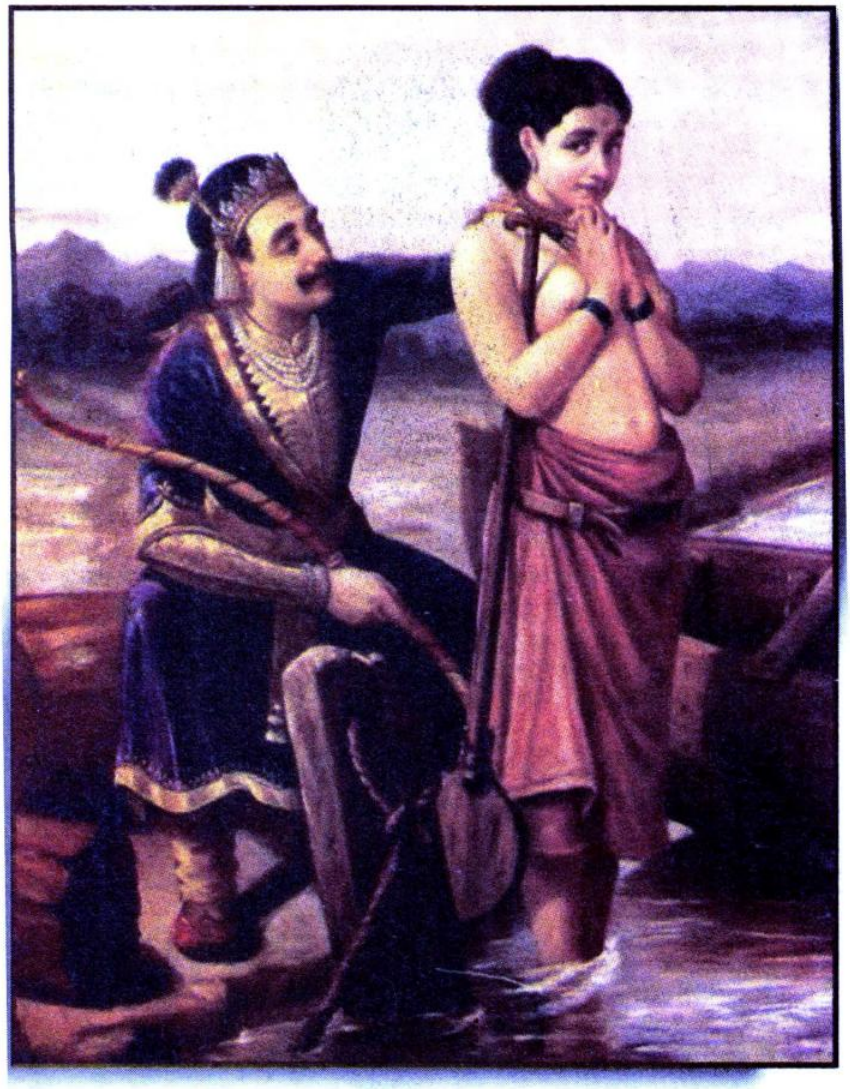

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অথৈ জল’ উপন্যাসে খ্যামটার আসরে গিয়ে খেমটাওয়ালি কিশোরী পান্নাকে দেখে তীব্র ভোগের ইচ্ছা জাগে মধ্যবয়সি ডাক্তার শশাঙ্কের। তারই ভাষায়, ‘রঙ ফরসা নয় বটে, কিন্তু একটি অপূর্ব কমনীয়তা ওর সারা দেহে।

রাহুল দাশগুপ্ত

ধর্ষণ, বাংলা সাহিত্যে

রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় মধুসূদনের কাছে শারীরিকভাবে আত্মসমর্পণ করতে। বাংলা উপন্যাসে সেই বোধহয় সূচনা। বিবাহিত স্ত্রী হয়েও অহংকারী স্বামীর শয্যায় যেতে কুমু নারাজ। কিন্তু একদিন গভীর রাতে কামতাড়িত মধুসূদন নিজের সমস্ত অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে কুমুর শরীরকে পেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল...।' এই ভাবে কুমু সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সেই প্রথম মিলিত হতে যায় মধুসূদনের সঙ্গে। পরদিন চন্দন গোলা জলে নিজেকে অনেকক্ষণ ধরে ধোয় কুমু। মুছে ফেলতে চায় সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণের চিহ্নগুলি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অথৈ জল' উপন্যাসে খ্যামটার আসরে গিয়ে খেমটাওয়ালি কিশোরী পান্নাকে দেখে তীব্র ভোগের ইচ্ছা জাগে মধ্যবয়সি ডাক্তার শশাঙ্কের। তারই ভাষায়, 'রঙ ফরসা নয় বটে, কিন্তু একটি অপূর্ব কমনীয়তা ওর সারা দেহে। ভারী চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। আমার হঠাৎ মনে হল, ওকে আমি বুকে টেনে নিয়ে ওর ফুলের মতো লাবণ্যভরা দেহটা পিষে দিই বলিষ্ঠ বাহুর চাপে। আমার মতো পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যবয়সি লোককে সতেরো-আঠেরো বছরের একটি সুন্দরী কিশোরী ভালোবেসে ফেলেছে, এ চিন্তা এক বোতল উগ্র সুরার চেয়েও মাদকতা আনে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের নায়ক রাজকুমার একজন 'চিন্তাগ্রস্ত নিউরোটিক'। প্রেমকে জানার আগে রাজকুমার জানতে উৎসুক প্রেমের ভিত্তি দেহকে। নিষেধ ভেঙে বেরোনোর প্রয়াস তার মধ্যে স্নায়ুবিকারের সৃষ্টি করে। গিরির বুকে হাত দিয়ে সে হৃদস্পন্দন অনুভব করতে চায়, রিনির নিরাবরণ দেহদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানালে সে রাজি হয় না। সরসী কালো হলেও সুন্দরী, রাজকুমারের কৌতূহল মেটাতে নিজেকে নগ্ন করতে কুণ্ঠিত হয় না সে। যৌনতা এভাবেই রাজকুমারকে তাড়িত করে এবং তথাকথিত শ্লীলতার বোধকেই সে আক্রমণ করে। 'অহিংসা' উপন্যাসে বিষয় হয়ে ওঠে আশ্রম খুলে ব্যাভিচার আর ধর্মের ব্যবসা। মাধবীলতাকে ভোগ করতে চায় 'মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সি দৈত্য' সদানন্দ। মানিক লিখেছেন, 'পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইল মাধবীলতাকে। মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইলো বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রইলো।...এতক্ষণে মাধবীলতা বুঝিতে পারিয়াছিল, আহ্বানটা খাটি অভিসারের, ধর্ষণের ফলে প্রেমের জন্ম হওয়ায় এতদিন যে পূর্বরাগের পালা চলিতেছিল, আজ তার সমাধি।'

রমেশচন্দ্র সেনের 'কাজল' উপন্যাসটির সঙ্গে বারবার তুলনা

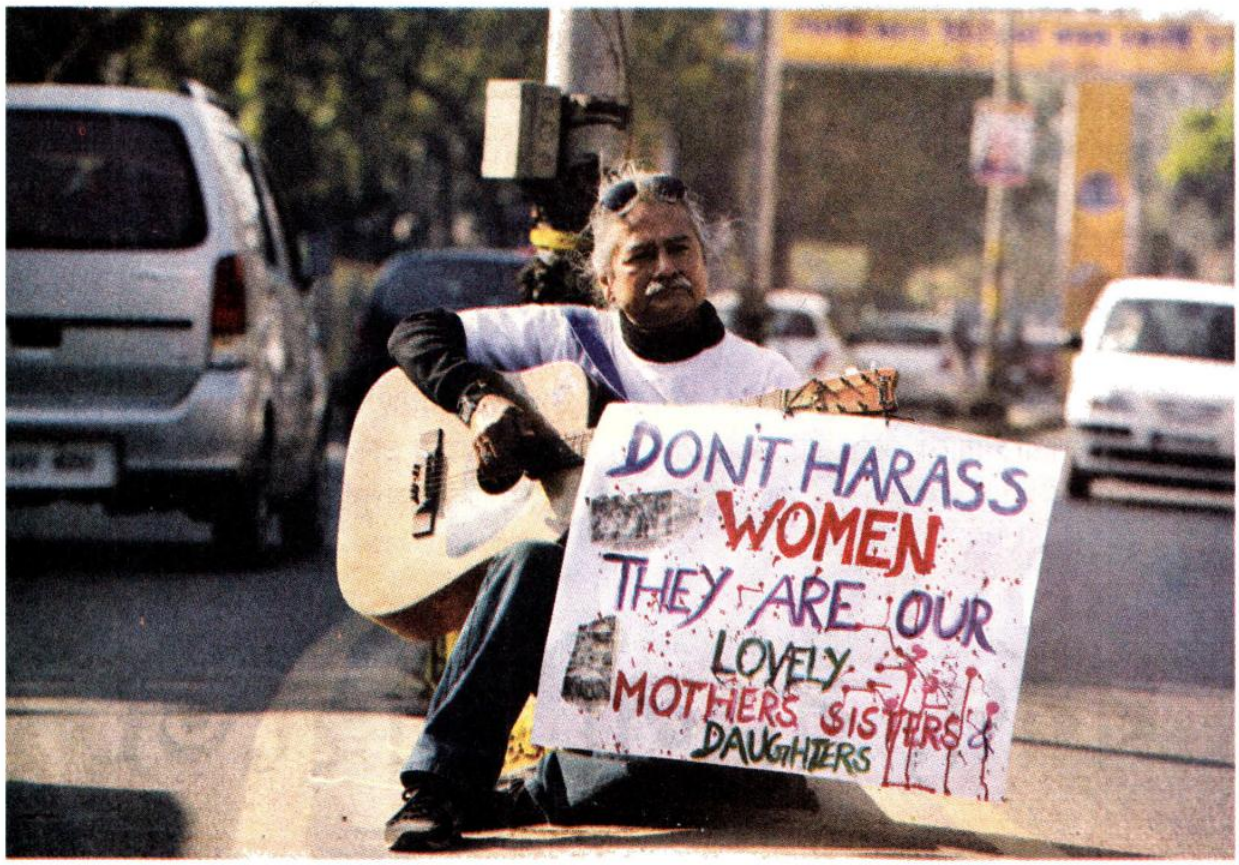

প্র চ্ছ দ

ননী ভৌমিকের 'ধুলোমাটি' উপন্যাসে রতনের বোন বারো বছরের সুধা বিয়ের ঠিক আগে প্রতীকী অর্থেই যেন শ্মশান দেখতে চায়। গর্ভবতী সুধার স্বামী এমনভাবে দিনের পর দিন তাকে বলাৎকার করে যে, পুরুষ দেখলেই সে আর সহ্য করতে পারে না।

টানা হয়েছে জোলার 'নানা', কুপরিনের 'ইয়ামাঃএকটি নরক', বা গোর্কির 'নিচুমহলে'র। বাংলা সাহিত্যে গণিকা-জীবনের এটিই 'প্রথম মৌলিক মানচিত্র।' প্রেমিক কাজলকে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়, রাষ্ট্র ও আইন কেড়ে নেয় সন্তানকে, সে চিনতে থাকে সমাজসেবী-মঠবাসী মোহান্ত-উকিল-অধ্যাপক-সাংবাদিক-বিধায়ক-পুলিশ-মন্ত্রীর অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্র অনুশীলিত সমাজের আসল মুখ, এইভাবে গোটা জীবন ধরেই কাজল যেন ধর্ষিত হতে থাকে, পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার হাতে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যাসকাল' উপন্যাসেও রয়েছে বেশ্যালয়ের নারকীয় কাহিনী। সুবর্ণ উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে, বিয়ের পর স্বামী তাকে তাড়িয়ে দেয়, সে সুবর্ণ থেকে সাবিত্রী হয়ে যায়, দেহব্যবসার টাকায় সংসার প্রতিপালন করে। সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'নীল আগুন' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, 'নেতাজী ম্যাসাজ ক্লিনিক'-এর তিনটি কিশোরী মেয়ে অঞ্জনা, রঞ্জনা, খঞ্জনা নিজেদের সতীত্ব নিজেরা দূষিত করেনি, করেছে সমাজ, সময় ও মানুষ।

ননী ভৌমিকের 'ধুলোমাটি' উপন্যাসে রতনের বোন বারো বছরের সুধা বিয়ের ঠিক আগে প্রতীকী অর্থেই যেন শ্মশান দেখতে চায়। গর্ভবতী সুধার স্বামী এমনভাবে দিনের পর দিন তাকে বলাৎকার করে যে, পুরুষ দেখলেই সে আর সহ্য করতে পারে না। অকালধর্ষণে বীভৎস হয়ে ওঠা সুধা বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই ফিরে আসে এবং বীরুকে দেখেও আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যায়। শ্বেতাঙ্গ এক মহিলা ইয়াসিনের গা টিপে দেখেছিল সে জানোয়ার কি না, ইয়াসিন তার বদলা নেয় শ্বেতাঙ্গ এক যৌনকর্মীকে তার পা চাটতে বাধ্য করে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে সুতারা শুধু নিজে অত্যাচারিত ও ধর্ষিতা হয়নি, নোয়াখালির বীভৎস দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে তার দিদিরও সন্ধান পাওয়া যায়নি, মা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ দেয়। সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ' উপন্যাসে রয়েছে দু'শো টাকায় বিক্রি হওয়া উদ্বাস্তু মেয়েদের শালীনতার কথা। সুলেখা সান্যালের 'ঘেন্না' গল্পে চাল চুরি করার অপরাধে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করতে চায় কয়েকজন সরকারি অফিসার। আখ্যানকারের ভাষায়, 'লোকটা যতই এগিয়ে আসে, বুকের কাপড় চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সৌদামিনী পিছিয়ে যায়। এতটুকু কুণ্ঠা নেই, আঁচল চেপে ধরে সরকারি লোক বলে, খোল কাপড়।'

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসে নায়িকা চন্দানিকে গজেন ঢালী বলাৎকার করে, জয় করতে পারে না। 'সোঁদাল' উপন্যাসে সভ্য সাফারি স্যুট পরা ধর্ষকের হাত থেকে তিন্নিকে বাঁচায় মোল্লাত তিনটে তির মেরে। বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়র 'দর্পণ' গল্পে রয়েছে মনুষ্যরূপী এক রাক্ষসের কথা।

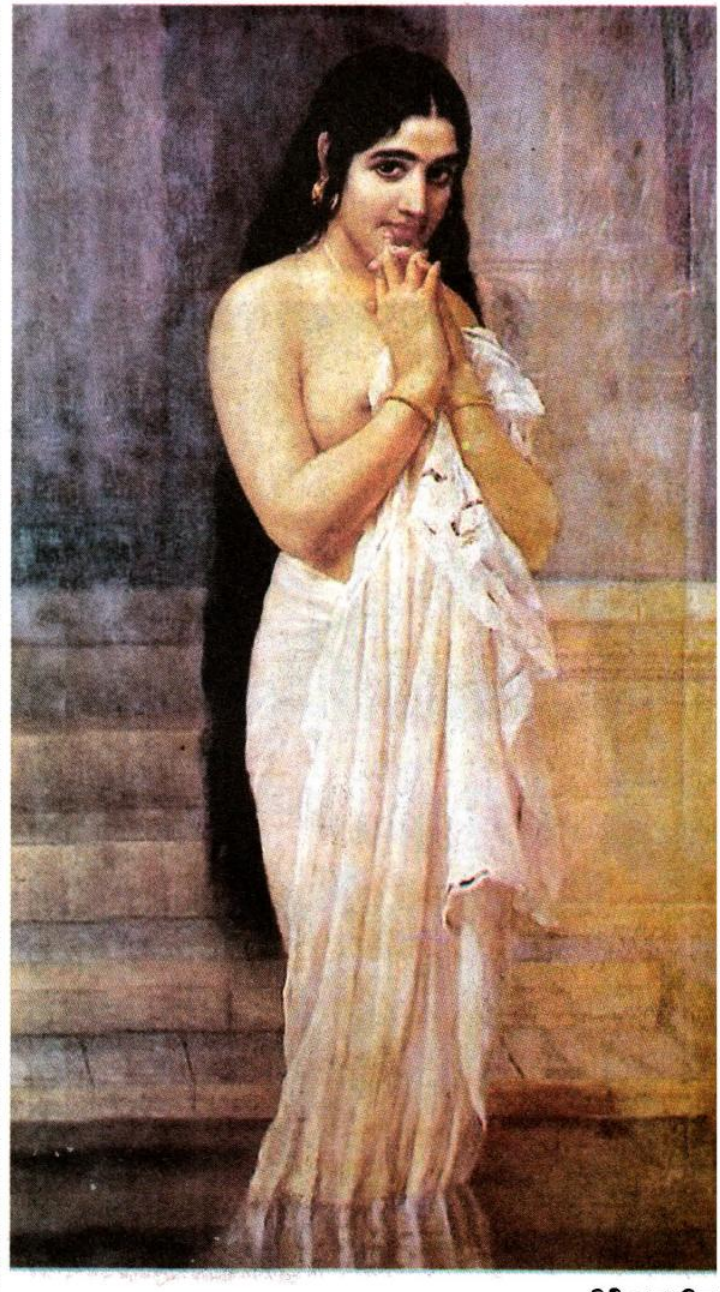

শিল্পী: রাজা রবি বর্মা

আখ্যানকারের ভাষায়, 'নারী মাংসের আস্বাদ পেয়ে সে লোলুপ চিতাবাঘের মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। যে মেয়ে একবার তার খপ্পড়ে পড়ত, তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে ছুটতে হত ডাক্তারের কাছে।... বিদ্যেদিদির গায়ে শক্তি কিছু কম ছিল না। ফলে বেশ খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি হল। কাপড়-চোপড় খুলে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই দানবের কাছে হেরে গেলেন।' বিমল মিত্রের 'সরস্বতীয়া' উপন্যাসে বাবা, স্বামী ও প্রেমিক, তিনজন পুরুষের হাতে একটি সুস্থ, সুন্দর আদিবাসী মেয়ের জীবন ধ্বস্ত, লুণ্ঠিত হয়।

সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক বীরেশ দৈহিক পবিত্রতা বা সতীত্বের মতো বোকামি বা বুজরুকিতে বিশ্বাস করে না, নীতাও করে না। যৌনতার মধ্যে দিয়ে নীতা স্বাধীনতা খোঁজে এবং সেই স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য বীরেশকে ব্যবহার করে। বীরেশ আর ব্যবহৃত হতে চায় না এবং সঙ্গমসঙ্গিনী নীতাকে হত্যা করে নিজের স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে। 'প্রজাপতি' উপন্যাসে পতিতাদের ওপর অসভ্য মার্কিন সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারের দৃশ্য সুখেনের অপরিণত মনে গভীর রেখাপাত করে। 'দুই অরণ্য' উপন্যাসের শেষে একটি 'দিকু' যুবতী মেয়েকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে চেকো এক দিকু লোককে হত্যা করে। 'বাথান' উপন্যাসে যদু খুন করে জটাকে, কারণ সে তার বোন দুর্গাকে ধর্ষণ করেছিল। কার্তিক লাহিড়ীর 'কাপুরুষ' উপন্যাসে অমলের দিদিকে গর্ভবতী করে দেয় জনৈক রাজনৈতিক দাদা এবং নিজেকে সে সমাজের আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 'অপদেবতা' উপন্যাসের নায়ক মনে মনে শ্লীলতাহানি করে চলে, 'শতদ্রু চম্পার ব্রার হুক খুলে তার টোপা টোপা আনার টেনে–ছুনে মিশমার করে দিতে চায়, আনারের দানা ফাটিয়ে চৌচির করতে চায়। আহ! একবার যদি পেতাম চম্পাকে, ফাটিয়ে দিতাম দশ আঙুলে আনার দুটি।' মিহির আচার্যের 'অতন্দ্র প্রহর' উপন্যাসে সীতা গুন্ডাদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েও জীবনের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'আঁধারমানিক' উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও পুরুষদের প্রতাপে কোণঠাসা হয়ে জীবনযাপন করতে ব্যধ্য হচ্ছে অন্ত্যজ মানুষ ও নারীরা। 'শ্রীশ্রীগণেশ মহিমা' উপন্যাসে জমিমালিক গণেশের হাতে গর্ভবতী ও কুমারী রুক্মিনি আত্মহত্যা করে। 'দ্রৌপদী' গল্পে নৃশংসভাবে দ্রোপদীকে ধর্ষণ করা হয়। মহাশ্বেতার বর্ণনায়, 'নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনও ওর দু'হাত দু'খুঁটোয় এবং দু'পা দু'খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। বুঝতে পারে, যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন?' যে দেশে প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে একটা করে নারী ধর্ষণ হয়, সে দেশের মালা মণ্ডল, পুতলিকে গণধর্ষণের কাহিনি নিয়ে গড়ে ওঠে, 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে'। আখ্যানকারের ভাষায়, 'ধর্ষণ আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ নয়, সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ।' গুণময় মান্নার 'লছমির মুক্তি' গল্পে লছমির ওপর নৃশংস অত্যাচার চালায় তার স্বামী, 'মোহন মুঠি পাকিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর মার খেয়ে লছমির জমির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। ওর জামাকাপড় বিপর্যস্ত, এলোমেলো চুলে মুখ ঢেকে গেছে।'

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুল ফোটার গল্প' কাহিনীতে রয়েছে এক ধর্ষিতা রমণীর তীব্র যন্ত্রণা ও জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার মরিয়া প্রয়াসের কথা। অসীম রায়ের 'নবাববাঁদি' উপন্যাসে দেবীকে দিনের বেলায় ভোগ করত আর্মেনিয়ান বুড়ো আর রাত্তিরে তাকে লোহার খাঁচায় পুরে রাখত। রূপী বারে বারে ধর্ষিতা হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে আভার গর্ভবতী হওয়ার সংবাদে কুবের একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। নিজেকে বাঁচাতে কুবের নৃশংসভাবে গলা টিপে আভাকে হত্যা করে, হত্যা করার আগে গর্ভবতী আভার সঙ্গে যৌনতার হালকা খেলাও সেরে নেয়। 'পরস্ত্রী' উপন্যাসে পরস্ত্রী মালতীকে দখল করতে চায় জগদীশ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' উপন্যাসে তপতীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রবি ব্যর্থ প্রেমের তাড়নায় আদিবাসী মেয়ে দুলিকে নিয়ে মেতে ওঠে ও তাকে ধর্ষণ করে। 'অর্জুন' উপন্যাসে লাবণ্যকে ধর্ষণ করতে চায় দিব্য। 'জোছনাকুমারী' উপন্যাসে অপ্রকৃতস্থ মেয়েটি পরিবার

শিল্পী: রাজা রবি বর্মা

প্র চ্ছ দ

প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসে দেখা যায় ভূমিদাসদের মেয়েরাও জমিদারের সম্পত্তি, তিনি তাদের ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারেন। 'দায়-দায়িত্ব' উপন্যাসে কাবেরী নামক এক যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়।

থেকে বিতাড়িত হয়, আড়কাঠির কাছে বিক্রি হয়ে যায়, শেষপর্যন্ত ধর্ষিতা হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। 'ধূলিবসন' উপন্যাসে মন্দিরাকে ধর্ষণ করতে চায় গ্রামের গরিব, অশিক্ষিত এক মুসলিম যুবক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' উপন্যাসে বিকলাঙ্গ ও অপ্রকৃতস্থ মনিরুজ্জামান দিনের পর দিন ধর্ষণ করে রুকুকে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে' উপন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায় ধর্ষণকারীরা। লেখকের ভাষায়, 'যখন তার শরীরের ওপর অবৈধ কর্ষণচিহ্ন দেগে দিয়ে গেল কয়েকজন অচেনা লোক, তখন অবাক আর অবাক, আর মূক আর বধির হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়া।' সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি উপন্যাসে বিষয় হিসাবে এসেছে 'ধর্ষণ'। 'কুকুর সম্পর্কে দুটো-একটা কথা যা আমি জানি' উপন্যাসে মণিকা তার প্রথম স্বামী দেবীতোষের বাড়িতে যায় নিজের মানসিক ভারসাম্যহীন পুত্র অনির হঠাৎ অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। রাতে মাকে একা পেয়ে পুত্রটি পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং মাকে ধর্ষণ করে। 'কলেরার দিনগুলিতে প্রেম' উপন্যাসে ধর্ষিতা বোন মাস্তু মানসিকভাবে ভারসাম্য হারায়। 'এখন জীবন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা' উপন্যাসে কল্লোল নমিতার বরকে কাজ পাইয়ে দেবার পূর্ণ সুযোগ নেয়। নমিতার পনেরো বছরের মেয়ে দ্রৌপদীকে ভোগ করে। 'আমি ও বনবিহারী' উপন্যাসে দিনের পর দিন বাড়ির কাজের মেয়ে আশাকে ভোগ করে বনবিহারী।

প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসে দেখা যায় ভূমিদাসদের মেয়েরাও জমিদারের সম্পত্তি, তিনি তাদের ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারেন। 'দায়-দায়িত্ব' উপন্যাসে কাবেরী নামক এক যুবতীকে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেলেও, প্রবাল কাজের মেয়ে যুবতী তরুকে ধর্ষণ করে। 'দায়বদ্ধ' উপন্যাসে নদী থেকে একটি বেহুঁশ ধর্ষিতা মেয়েকে উদ্ধার করে ধনপত। মতি নন্দীর 'বাওবাব' উপন্যাসে পারুল রাঘবেন্দ্রের নামে ধর্ষণের অভিযোগ আনলে ষোলো বছরের কারাবাস হয় রাঘবেন্দ্রের। আবদুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসে হরেনের বউ সিন্ধুকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করা হয়। 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' উপন্যাসে কাল্পনিক বন্দিশিবিরের হতভাগ্য মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলেছেন 'নারীত্বের যে ভীষণ অবমাননা সঞ্চিত হয়েছে এখানে

শিল্পী: রাজা রবি বর্মা

দিন-রাত্রি ধরে, তার ইতিহাস লিখবে কে? বলেছি কি যে রাত্তির হলে মেয়েগুলোকে ঘরে পুরে দিয়ে ওরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়?'

কবিতা সিংহের 'একটি খারাপ মেয়ের গল্প' উপন্যাসে উনিশ বছরের অলকা 'খারাপ মেয়ে', সে নিছক ধনীর রক্ষিতা হয়ে থাকার বদলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' উপন্যাসে শুভেন্দু শুধুমাত্র যৌনতার প্রয়োজনে সুলেখাকে ডাকে। দেবেশ রায়ের 'মানুষ খুন করে কেন' উপন্যাসে ঠান্ডা মাথায়, বিছানায় শুয়ে গোলাপকে হত্যা করে অশ্বিনী। 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'র অনেকটা জুড়েই রয়েছে পাহাড়িয়া গ্রামের পাঁচ ধর্ষিতা নারী ও ধর্ষণের কথা। আখ্যানকারের ভাষায়, আমাদের সমাজে একবার ধর্ষিতা মেয়ে তো বেশ লোভনীয়। গ্রামের মেয়েরা তো নিজের শরীর নিয়ে নিজের বাপকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। আর, পুরো ঘটনাটা ঘটে কত দ্রুততায়? সেখানে একটা মেয়ে বুঝে উঠতে পারার আগেই তো যা হওয়ার হয়ে যায়। অথচ, হাজারবার প্রকাশ্য আদালতে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তখন এই করলে কেন, ওই করলে না কেন, চেঁচালে না কেন, দারোগার কাছে গেলে না কেন? আরে, মেয়েটা তো তখন ভাবছে যতজনের কাছে সে যাবে প্রত্যেকে তাকে আরও একবার করে রেপ করবে।' অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাসে যুবতী রাধাকে সাহেবপুত্র বাবনের হাত থেকে বাঁচতে নিরুপায় হয়ে ফিরে আসতে হয় গ্রামে।

বাসুদেব দাশগুপ্তের 'বসন্ত উৎসব' গল্পে আছে সেই বীভৎস বর্ণনা—'... সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। মণিকাকে উল্টে ফেলে দুই হাঁটু গেড়ে আমি ওর পিঠের ওপর চেপে বসি। প্রচণ্ড শক্তিতে বালিশের মধ্যে ঠেসে ধরি মণিকার মুখ। কাটা ছাগলের মতোই মণিকা ছটফট করে...।' সুবিমল মিশ্রের 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো' উপন্যাসে রয়েছে, 'মেয়ের আমার আট বছর বয়েস। রোজই রেললাইনে কয়লা কুড়োতে যায়। ...হঠাৎ কয়েকটি লোক ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চেপে ধরে। পাশের জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়। পরে তাকে দেখি, মাটিতে পড়ে, বিবস্ত্র, গলায় স্বর বেরোচ্ছে না।' চণ্ডী মণ্ডলের 'ভাসান' গল্পে বিবাহিত স্ত্রী নির্মলাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে নব। লেখকের ভাষায়, 'নির্মলার দেহে তখন অতৃপ্ত খিদের উন্মত্ত নাচন।'

কমল চক্রবর্তীর 'ব্রাহ্মণ নবাব' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে সত্তর বছরের কুলীন ব্রাহ্মণ নরোত্তম তর্কালংকারের কাহিনি, যিনি ১১০টি বিবাহ করেছেন, যার মধ্যে ৯০ জন গর্ভধারণ করেছে, ২৭০টি সন্তানের পিতা তিনি একা। এই রচনায় নবাবদের হারেমের সঙ্গে তুলনা করেছেন এইসব পৈশাচিক ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের, দয়া করে নারীকে সঙ্গম করাই ছিল যাদের জীবনে কার্নিভ্যাল। আবার 'অলীক গসপেল'-এর নায়ক উল্টোদিকটাও দেখে ও বলে, 'বেশিরভাগ মেয়েই তো যৌনতা তৈরি করে।' উদয়ন ঘোষের 'স্বপনের ম্যাজিক রিয়েলিটি' উপন্যাসের নায়ক স্বপন মনে করে, 'দেয়ার ইজ নো রেমিডি ফর সেক্স বাট মোর সেক্স।' আর সে স্বপ্নে-বাস্তবে একের পর এক নারীর শ্লীলতাহানি করে চলে। স্বপন যেন এক জাদুবৎ বাস্তবে ঢুকে যায়, যখন সে শ্লীলতাহানির বর্ণনা দেয়, 'তবে কেউ এক মুহূর্তেও নষ্ট করবে না। কেউ স্তন, কেউ নিতম্ব, কেউ কান, কেউ যোনিতে স্পর্শ দেবে। একেই বলে বহুরতি। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন আ ওয়াইজ ম্যান অ্যান্ড আ ফুল হোয়েন দে ফল ইন লাভ, ইন সেক্স ফ্যানটাসি। লাভ ক্যান অনলি ফ্লারিস অ্যাজ লং অ্যাজ ইট ইজ ফ্রি অ্যান্ড স্পন্টেনিয়াস। ইট টেনডস টু বি কিলড বাই দ্য থট দ্যাট ইট ইজ ডিউটি, ম্যারেজ-বাউন্ড।'

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'মাটির অ্যান্টেনা' উপন্যাসে শুধু পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে দিবাকর নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে মারে। অভিজিৎ সেনের 'মৌসুমী সমুদ্রের উপকূল' উপন্যাসে যুগল নির্মমভাবে ধর্ষণ করে মঞ্জরীকে, 'আর দেরি না করে তার দাস দু'জনকে ডেকে তাদের সহায়তায় জোর করে বালিকার অক্ষতযোনি ছিন্ন করল যুগল, বালিকা যত জোরে আর্তনাদ করল, যত দ্রুত শয্যাকে সে রক্তাক্ত করল, যুগল তত নিশ্চিন্ত হল।' 'আঁধারমহিষ' উপন্যাসে তিনজন মিলে ধর্ষণ করে অলকানন্দাকে। 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসে ইরাবতীর শ্লীলতাহানি করা হয়। ভগীরথ মিশ্রের 'মৃগয়া' উপন্যাসে নিশান বাউরির বউকে বারে বারে ধর্ষণ করে সপারিষদ সুদর্শন সিংহবাবু। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ' রামপদর অশন-ব্যসন' উপন্যাসেও রয়েছে ধর্ষণ, 'রামপদ দু-বাহুতে উদোম উত্তরাকে পিষে ধরে। নোনতা ঘাম-গন্ধ কিছুই টের পায় না।'

আবুল বাশারের 'মরুস্বর্গ' উপন্যাসে রিবিকাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় একদল ডাকাত, তার গায়ের পোশাক টেনে ছিঁড়ে দেয় তারা। আফসার আহমেদের 'মেটিয়াবুরুজের কিসসা' উপন্যাসে শফি একরাত্রির পরপর দুই প্রহরে মায়ের শয্যায় অথবা মেয়ের শয্যা থেকে মায়ের শয্যায় গমনাগমন করতে চায়। শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের 'বাৎস্যায়ন ও বৃন্দাবনী' উপন্যাসে ধর্ষণ শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় পারস্পরিত সম্ভোগে, 'লোপার

কবিতা সিংহের ‘একটি খারাপ মেয়ের গল্প’ উপন্যাসে উনিশ বছরের অলকা ‘খারাপ মেয়ে’, সে নিছক ধনীর রক্ষিতা হয়ে থাকার বদলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। ‘গোধুলিসন্ধির নৃত্য’ উপন্যাসে শুভেন্দু শুধুমাত্র যৌনতার প্রয়োজনে সুলেখাকে ডাকে।

উপর শায়িত আমি যখন তার দুটি স্তন সর্বশক্তিতে মর্দন করি, সে বারংবার আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমায় আরও উন্মাদ করে তোলে... আমি ওর যোনিতে লিঙ্গের ছোঁয়া দিলে ও ওর বিস্ফারিত যোনি আমার ঠোঁটের উপর স্থাপন করে, আমি সেই যোনি লেহন করে ওকে কাতর করে তুললে ও আমার লিঙ্গটি মুঠোয় ধরে চাপ দেয় ও মুখে গ্রহণ করে...।’ এই কাহিনিতে বাৎস্যায়ণ তার মায়ের ধর্ষিত হওয়ার কাহিনি জানতে পারে পিতার কাছ থেকে।

অমর মিত্রের ‘ধ্রুবপুত্র’ উপন্যাসেও এসেছে ধর্ষণ। লেখকের ভাষায়, ‘চতুরিকা কী বলতে গেলে উদ্ধব তার মুখে উত্তরীয়ের একটা অংশ গুঁজে দেয়। এই ভাবে গতকাল সে ধর্ষণ করেছে একটি কিশোরী কন্যাকে, যে ছিল সম্পূর্ণ কুমারী। এতবার পুরুষসঙ্গ করার পরও ধর্ষিতা হতে হতে চতুরিকার চোখে জল এসে যায়। অনেকটা সময় পরে উদ্ধব ক্লান্ত হয়। চতুরিকার মুখ থেকে গোঁজা উত্তরীয় বের করে এনে তার নগ্ন, ধর্ষিত শরীর দেখতে থাকে।’ ‘নিমগাছ’ গল্পেও অষ্টমীকে বুনো ঝোপের ওপর ফেলে দু’জন ধর্ষণ করে, প্রথমবারের পরই কষ্টে, বেদনায় সে জ্ঞান হারায়। নলিনী বেরার ‘শবর-চরিত’ উপন্যাসে খালভরা ধানকাটা বিলের জঙ্গলে একা পেয়ে কুদরা সান্তালের মেয়ে

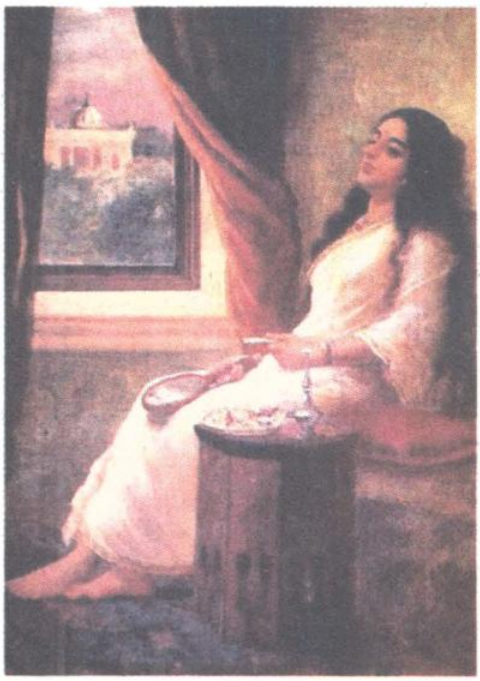

শিল্পী: রাজা রবি বর্মা

মরণীকে ধর্ষণ করে যায় কিছু লোক। কিন্নর রায়ের ‘তৃষিত স্বর্গের আলো’ উপন্যাসে রয়েছে শাপলা চাকমা নামে এক লাঞ্ছিতা তরুণীর কথা। শচীন দাসের ‘বোবাযুদ্ধ’ গল্পে গুন্ডাদের হাতে ধর্ষিত হয় মিতু, তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, ‘শনাক্তকরণ’ গল্পেও একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে যার আততায়ী, তাকে খোঁজার প্রয়াস চলে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নদী মাটি অরণ্য’ উপন্যাসে বিভীষণ সামন্তের হাতে ধর্ষিতা লবঙ্গলতার প্রতি কামতাড়িত রাম আবিস্কার করে আসলে সে তার মা, ‘তার মায়ের যে স্তন পান করে সে জীবনের প্রথম দেড়বছর অতিক্রম করেছে, সেই স্তন দেখেই কি না সে মুগ্ধ হল এক পুরুষের মতো।’ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ’ এবং ‘যে মেয়েটি মোহময়ী হতে চেয়েছিল’ গল্পদুটিতে বিষয় হিসাবে এসেছে ধর্ষণ। প্রথমটিতে মন্টু তার দলবল নিয়ে বাসন্তীকে গ্যাং-রেপ করে। দ্বিতীয়টিতে সোনালিকে গ্যাং রেপ করা হয়, সব চিহ্ন মুছে ফেলতে চায় কাশীনাথ। লেখকের ভাষায়, ‘যোনিমুখে জমাট বাঁধা কালচে রক্ত, এই প্রথম কোনও যোনি স্পর্শ করল কাশীনাথ, মৃতমানুষের।’ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ‘কালাধার’ উপন্যাসে তারকেশ্বরের প্রথম কীর্তি ছিল একটি কুমারী মেয়ের গর্ভসঞ্চার করে দেওয়া।

দেবর্ষি সারগীর ‘লুপ্ত নগরী’ উপন্যাসে বিদেশি শাসকের সৈনিকেরা মেয়েদের ওপর নির্বিচারে ধর্ষণ চালায়। একটি মেয়ে বলে, ‘ওরা ক্রমে আরও উন্মাদ হয়ে উঠল। কেউ কেউ দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বারের জন্য আমার ওপর ঝাঁপ দিল। এর পর একসঙ্গে অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আমার ওপর। একবার লক্ষ্য করলাম, আমি নিজের রক্তের ওপর ভাসছি।’ সৈকত রক্ষিতের ‘ধুলো উড়ানি’ উপন্যাসে পুরুষের মনোরঞ্জনের নানা ধরনের মেলায় লাস্যময়ী হয়ে ঝুমুর নাচতে হত রবনকে, তখন তার নাম হাজারী। রবনের অতীতের সূত্র ধরে সাঁওতাল সমাজ রায় দেয়, সে আসলে ডাইন। অনিল ঘড়াইয়ের ‘বনবাসী’ উপন্যাসে মংরুর হাতে শনিচরীর ধর্ষণ হয়। ‘অনন্ত ভ্রাঘিমা’য় ধর্ষিত হয় লাবণি, ‘শুকনো আলসের বিছানায় তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয় কালো আকাশের নীচে। তারপর পর্যায়ক্রমে শুরু হয় ধর্ষণের মহড়া।’

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসে রমিতা ও পলাশ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় রমিতা চারজন অল্পবয়সি যুবার দ্বারা আক্রান্ত হয়। অন্য দিকে রমিতার স্বামী নিজের স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে করতে বলে উঠেছিল, ‘দেখি কোন শ্রবণা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে।’ মল্লিকা সেনগুপ্তের ‘শ্লীলতাহানির পরে’ উপন্যাসে ধর্ষিতা আদিবাসি রমণী মালতি মুদির কেসটা নিতে চেয়েছিল যে মন্দিরা, তারই স্বামী তার অধস্তন রিকি সেনের শ্লীলতাহানি করে। ❖

গল্প ১

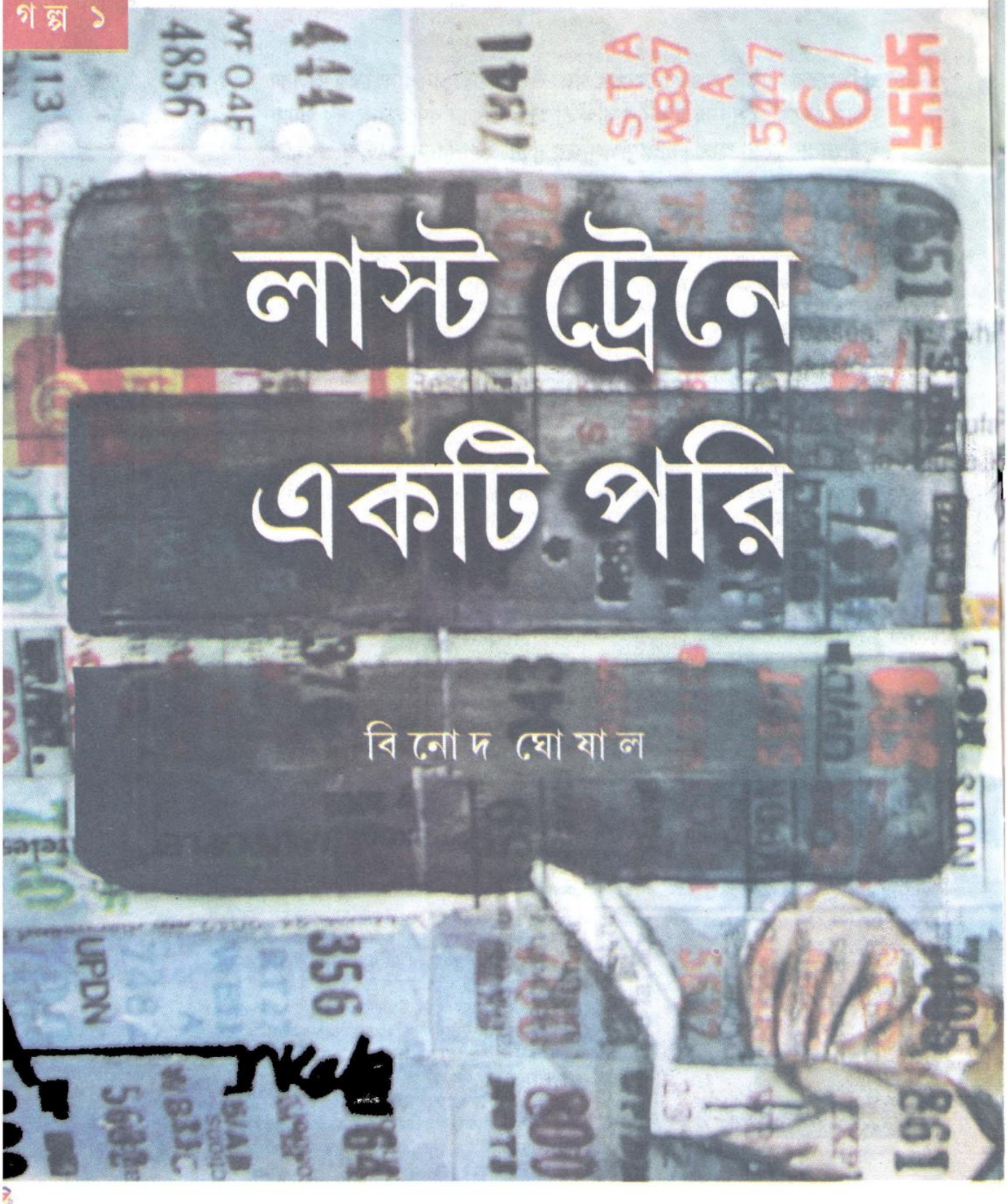

লাস্ট ট্রেনে একটি পরি

বিনোদ ঘোষাল

—দাদা ক'টা বাজে? কথাটা শুনতে পেল না খেটো। একমনে বিড়ি টানতে লাগল। আজ সকাল থেকে প্রচুর খাটনি গেছে। অলরেডি বারোশোর ওপর প্লেট পড়ে গেছে। এখন রাত এগারোটা দশ।

আরও দুটো ব্যাচ বসবে। আর ভাল্লাগছে না। অনেকদিন পর দুম করে এতটা খাটনি পড়ায় কোমর টাটাচ্ছে। কাল আবার একটা আছে। সিজিন সবে বউনি হল। এখন পরপর চলবে।

'ক'টা বাজে একটু বলবেন দাদা?' মিহি চাপা গলায় আবার একই প্রশ্ন।

এবার ফিরে তাকিয়ে একটু চমকাল খেটো। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পরিটা জিজ্ঞেস করছে। ভালো করে আবার তাকাল। ইরিহ এটা জ্যান্ত পরি! গ্লা দেখে মনেই হচ্ছিল না এতক্ষণ। পরিটা একদৃষ্টে খেটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সাদা ধপধপে ফুলহাতা ফ্রক। ফ্রক ফেটে এক্ষুণি বুকদুটো বেরিয়ে আসবে মনে হচ্ছে এইসান টাইট। পায়ে নার্সদের মতো লম্বা সাদা মোজা। হাতেও মোজা পড়া সাদা রঙের। মাথায় ফুল ফুল সাদা ফিতে আর হাতে ধরা একটা ছোট্ট লাঠি। সেটার আগায় আবার রুপোলি তারা বসানো। সব থেকে মজার হল পরিটার পিঠে দুটো ফিনফিনে কাপড়ের ডানা।

সবমিলিয়ে খেটোর চোখে ধাঁধা লেগে গেল। মাইরি, চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলছে না পরিটা। পুরো স্ট্যাচুর মতো বিয়েবাড়ির গেটের সামনে সাঁটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এতক্ষণ।

একটা হাই পাওয়ারের নীলচে লাইট ফেলা রয়েছে পরিটার গায়ের ওপর। সাদা ড্রেসে নীল আলো পড়ে ফাটাফাটি লাগছে কিন্তু মাইরি উফফ...! ভেতর পর্যন্ত কুটকুট করে উঠল খেটোর। তবু আরেকবার কনফার্ম হওয়ার জন্য আরেকটু সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করলেন?'

পরিটা ঠোঁট ফাঁকা না করে চাপা গলায় শুধু বলল, হুঁ।

খেটো রিস্টওয়াচে তাকিয়ে বলল, সোয়া এগারোটা।

ইসস কী দেরি হয়ে গেল! নিজের মনেই বিড়বিড় করল পরিটা। ওর লাল ঠোঁট, গোলাপি গালের ওপর অভ্রকুচি চিকচিক করছে।

এবার বেশ মজা লাগল খেটোর। আরেকটু কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এসছেন কোত্থেকে?'

প্রশ্ন শুনে মেয়েটা একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সামনাসামনি কেউ আছে কি না দেখে নিল। তারপর ঠোঁট চেপে বলল, 'লিলুয়া।'

'ওহ্। আমি তো শিবপুর থাকি।' এমন করে বলল খেটো, যেন এক উঠোনে পাশের বাড়ি।

'ও আচ্ছা।' বলে থেমে গেল মেয়েটা। শুধু চোখ ঘুরিয়ে বারবার চারদিকে দেখছে সামনাসামনি কেউ রয়েছে কি না।

'কাউকে খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করল খেটো।

'না না। আসলে ডিউটির সময়ে আমাদের কথা বলতে নেই তো...'

'ধেস...মাইরি কেউ নেই। সব এখন খাবার জায়গায় হামলে পড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখুন না গিয়ে। একজন খাচ্ছে, আর তার পেছনে মড়া ছুঁইয়ে থাকার মতো করে আরেকজন সিট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা উঠলেই সেই সিটে বসবে বলে। সন্ধেবেলায়, বুঝলেন তো সবক'টা মাল, এখন খাব না পরে খাচ্ছি করবে, তারপর একটু রাত হলেই সবক'টা মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পুরো ভিকিরির মতো খামচাখামচি করে মাইরি।' খেটোর কথা বোধহয় শুনলই না মেয়েটা। শুধু বলল, 'এত রাত্তির হয়ে গেল আজ, কী করে বাড়ি ফিরব বুঝতে পারছি না। এ রকম হবে জানলে আমি আজকের ডিউটিটা নিতামই না।' পরিটার মুখ নীল আলোয় এবার একটু ফ্যাকাশে লাগল দেখতে।

'কেন আপনার সঙ্গে আর কেউ আসেনি?'

—নাহ্। আরেক জনের ডিউটি ছিল আমার সঙ্গে। ওর সঙ্গেই ফেরার কথা ছিল আমার। কেন এল না কে জানে!

—তা আপনি আগে চলে গেলেন না কেন?

—নিয়ম নেই। লাস্ট ব্যাচ পর্যন্ত ডিউটি থাকে আমাদের।

—আরে ধের! লাস্ট ব্যাচ এখনও অনেক দেরি।

—আরও দেরি! তাহলে...?

অসহায়ভাবে তাকাল মেয়েটা খেটোর দিকে।

'তাহলে আর কী, বাড়ি যান। কেউ এত রাত্তিরে খুঁজবে না আপনাকে। যান যান। মেয়েছেলে এত রাত্তির পর্যন্ত...' বলে থেমে গিয়ে আরেকটা বিড়ি ধরিয়ে পরিটার ফিগার চোখ দিয়ে মাপতে থাকে খেটো। উস...স বুক তো না, পুরো সরবতি লেবু মাইরি! বাইরে থেকে সাইজ যা দেখাচ্ছে, বোঝাই যায় ভেতরে হেব্বি রস হবে। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলে খেটো বলল, 'কী হল ভয় লাগছে নাকি?'

'এগারোটা চল্লিশে লাস্ট ট্রেন।' বলে থেমে গেল মেয়েটা।

খেটো বুঝে গেল মেয়েটা এত রাতে ট্রেনে চাপতে ভয় পাচ্ছে। নিজের শুকনো ঠোঁটদুটো একবার চেটে নিয়ে বলল, 'এক কাজ করতে পারেন, আমি তো এখন বেরোচ্ছি। আপনি চাইলে আমার সঙ্গে চলে আসতে পারেন।'

'আপনি যাবেন!' মেয়েটা যেন হাতে চাঁদ পেল। আমি এক্ষুণি আসছি, ড্রেসটা ছেড়েই। বলে হন হন করে লেডিস টয়লেটের দিকে হাঁটা লাগাল মেয়েটা। পিঠে সাঁটা ডানাদুটো এমনভাবে হাঁটার তালে দুলতে থাকল যেন এক্ষুণি পাখি ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই একা একা হিঃ হিঃ করে হেসে নিল খেটো। নাহ্ আর দেরি না, পট করে রাতের খাবারটা প্যাকেট করে নিয়ে ধাঁ মারতে হবে।

খেটো ঘোষ। ভালো নাম গণেশ ঘোষ। লিলুয়া কারশেডের পাশের বস্তিতে জন্ম, বড় হওয়া। ছোটবেলায় ডাকনাম ছিল গনা। ওর ন'বছর বয়সে বাবা লিলুয়া কারশেডে লোকাল ট্রেনের পার্টস হাপিস করতে গিয়ে জিআরপি-র হাতে সাস্টিং হয়ে যায়। বিধবা মায়ের তখন আঠাশ-উনত্রিশ চলছে। ভরপুর অবস্থা। বছরদেড়েক পার না হতেই শেখ সিরাজুলের সঙ্গে মা আবার সেটিং করে ফেলল। গনার পুরো কুত্তার হাল। নতুন আব্বা সিরাজুলের খৈনি কাটার গুমটি দোকান। ঘরে উৎকট খৈনি পাতার গন্ধ। কয়েকদিনের মধ্যেই গনা বুঝে গেছিল নিজের রাস্তা নিজেকে দেখতে হবে। সিরাজুল চাইত গনা ওর ব্যবসায় হেল্প করুক। গনা চাইত না। একদিন রাতে সিরাজুল মালমুন্ডা খেয়ে এসে গনা আর ওর মাকে উদুম ক্যালাল। ক্যালানির চোটে চোখে অন্ধকার দেখল গনা। পরদিন মা ঠিক হয়ে গেল, গনা হল না। ঘর ছেড়ে দিল। পাশের পাড়াতেই আকবরের বিড়ির দোকানে জয়েন করল। এলাকায় আকবরের বিড়ি ছিল প্রসিদ্ধ। দোতলা গুমটি। ওপর তলায় শুধু দোকান আর একতলায় কুঁজো হয়ে বসে গনা আর আরও তিনজন মিলে দু'বেলা বিড়ি বাঁধত। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হত একতলায়। সোজা টানটান হয়ে বসারও উপায় ছিল না। তাহলেই ছাদ মাথায় ঠেকবে। সারাদিন ধরে লাল সুতোর আকবর বিড়ির সুতলি পাকাতে পাকাতে কোমর টাটাত। বিনিময়ে দু'বেলা খাবার আর মাসে চারশো টাকা। রাত্রে ওই গুমটির একতলাতেই পুটকি ছাড়া কোশ্চেন মার্ক হয়ে শুয়ে থাকত গনা।

তারপর যখন স্বপ্নে 'শীলা কি জওয়ানি' আসতে শুরু করল তখন আর শুধু বিড়ি বাঁধতে ভালো লাগল না। শুধু বিড়ি বাঁধার পয়সায় শীলা-লীলা কোনও শালা আসবে না বুঝে গিয়ে রেল স্টেশনের সামনে অনেকদিন বন্ধ লক্ষ্মীমিলের ভেতর চোলাই সুভাষের চ্যালা হয়ে গেল গনা।

এইভাবেই তিন বছর। তারপর যখন স্বপ্নে 'শীলা কি জওয়ানি' আসতে শুরু করল তখন আর শুধু বিড়ি বাঁধতে ভালো লাগল না। শুধু বিড়ি বাঁধার পয়সায় শীলা-লীলা কোনও শালা আসবে না বুঝে গিয়ে রেল স্টেশনের সামনে অনেকদিন বন্ধ লক্ষ্মীমিলের ভেতর চোলাই সুভাষের চ্যালা হয়ে গেল গনা। চুন্নুর রমরমা বিজনেস ছিল সুভাষের। সঙ্গে অন্য একটা ব্যবসা চলত ওই মিলের ভেতরেই, লুকিয়ে। খেটো বোম বাঁধার কাজে। পেটোরই ছোট ভাই খেটো। ওই খেটো সেকশনেই নাম লেখাল গনা। বিড়ির সুতলি

বাঁধার অভিজ্ঞতাটা কীভাবে যেন কাজে লেগে গেল এই লাইনে। হু হু করে উন্নতি। সবাই বলতে শুরু করল গনার হাতে জাদু আছে। একটা মালও মিস হয় না। দূর দূর থেকে পার্টি আসতে শুরু করল। সুভাষ হেব্বি খুশি। ফ্রিতে একটা ঘর দিয়ে দিল গনাকে, থাকার জন্য।

নাম ছড়িয়ে গেল গনার। সবাই ডাকতে শুরু করল খেটো গনা। তারপর একদিন কবে যেন গনাটাও খসে গিয়ে শুধুই খেটো হয়ে গেল ও। দিন-রাত কাজ। কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে পড়লে চুল্লু সেকশনের হারান আর বুড়োর বিধবাদুটোর বুকে মাঝেমধ্যে চুমুক দিত ও। হারানের বিধবাটার ছিল মাইরি কচি ডাব! চুমুক দিলেই আহ... সব ঠান্ডা। গায়ে গাঁদা পাতার মতো বুনো গন্ধ বেরোত 'ভরপুর জওয়ানি' মেয়েটার। খেটোর থেকে বয়স বছর কয়েক বেশিই ছিল। তবু মা কসম, ওকেই ঘরে তুলবে ভেবেছিল খেটো।

কিন্তু লোচা হয়ে গেল একদিন বোম বাঁধতে গিয়ে আচমকা স্লিপ করল একটা বাঁধন। মালটা মেঝেতে হড়কানো মাত্র চেঁচিয়ে উঠল। ব্যাস! কপাল জোরে খেটো প্রাণে বাঁচল ঠিকই, কিন্তু স্প্লিন্টারে নাকের খানিকটা, নীচের ঠোঁট, ডান হাতের দুটো আর বাঁ হাতের একটা আঙুল হাওয়া হয়ে গেল। বোম বাঁধা পাকা আঙুলের কাজ। তো সেই আঙুলই যদি তিন-চার পিস মিসিং থাকে তো চাকরি থাকবে কী করে? চাকরিটা গেল। তবে দয়ালু সুভাষ ঘরছাড়া করল না ওকে। হারানের বউটাও মাইরি তারপর কয়েকদিন পিড়িতের চুলকানি দেখিয়ে আস্তে আস্তে কাট মেরে গেল। শীলা কি জওয়ানি বিলা হয়ে যাওয়ার পর পুরো ফ্যা ফ্যা হয়ে গেল খেটো। পাড়া-বেপাড়ার আর কোনও ভদ্দরলোকের মেয়ে-বউ তো দূরের কথা ঝি-ফিগুলোও ফিরে তাকাত না ওর দিকে। সারাক্ষণ রাগে জ্বলত। কিন্তু কিস্যু করার নেই। এমন বিষ থোবড়া কোন মেয়েই বা হজম করবে। বাজারের মেয়েছেলেগুলোর কাছে গিয়েও বেশ কয়েকবার গিয়ে খেটো বুঝেছে ওগুলোও শালা ভেতরে ভেতরে হেব্বি ঘেন্না করে খেটোকে। আঁতে লাগে বলে ওইদিকেও যাওয়া ছেড়ে দিয়ে বাধ্য হয়ে একসময় সব মেনে নিতে শুরু করেছিল ও। বেকার বসে থাকতে থাকতে জমানো টাকাগুলো সব ফুরিয়ে গিয়ে হাতে হ্যারিকেন হয়ে যাওয়ার আগেই পাড়ার মনোময়দার ক্যাটারিংয়ের কাজে লেগে গেল। ঠাকুরের হেল্পার। মাংস ধোয়া, কিমা করা, আলুর চোকলা ছাড়ানো, ফিস ফ্রাইয়ের পুর তৈরি করা এইসব কাজ। মনে দুঃখ হত একেক সময়। কিন্তু পেট শালা বহুৎ হারামি। কোনও প্রেস্টিজ ফেস্টিজের ধার ধারে না। অভ্যেস হতে শুরু করল এক সময়। পার ডে একশোকুড়ি টাকা হিসেবে সিজিনে মাল্লু খারাপ আসে না। বাকি সময়গুলোতে এই তাই করে গুঁজে মুজে চালিয়ে দেওয়া। একা পাবলিক। নিজের ঘর আছে। আর কী চাই। এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল যখন, বাকিটুকুও যাবে।

প্যাকেটের লাস্ট বিড়িটায় লাস্ট টান দিতে দিতে

খেটো দেখল মেয়েটা আসছে। ফুলহাতা সবুজ রঙের কলারওলা সালোয়ার। পিঠে ডানাদুটোও আর নেই। শেষ সুখটানটা দিয়ে বিড়ি মাটিতে ফেলে হাতের তালুদুটো ভালো করে ঘসে নিল একবার।

নভেম্বর মাসের রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ। ছিকছিকে ঠান্ডা। খাঁ খাঁ প্ল্যাটফর্ম। ডাউন লোকাল ট্রেনটা খানখান শব্দ করতে করতে এসে দাঁড়াল। খেটো আর মেয়েটা উঠল। কামরায় একটা প্রাণীও নেই। চট করে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল খেটো। উহ্। ট্রেন তো না। একেবারে ফুলশয্যার ঘর মাইরি! ভেবেই ফিক করে একবার হাসল ও। শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে বলে ঢপ দিয়ে আজ কাট মেরেছে। অবশ্য তা বলে নিজের রাত্রের খাবারটা প্যাকেটে নিতে ভোলেনি। জানলার ধারে মুখোমুখি বসল দু'জন। ট্রেন ছাড়ল।

মেয়েটা এবার একগাল হেসে বলল, 'ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। নইলে যে কী হত।' বলেই একঝলক খেটোর কোলে রাখা খাবারের প্যাকেটটার দিকে তাকাল। ওটাকে পাশে সরিয়ে রেখে মুখে কিছু না বলে শুধু একটু হাসল খেটো।

—না না। জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিয়ে সব কিছুতেই।

—হুম। তা মাঝেমধ্যেই তো মনে হচ্ছে আপনার এমন রাত্তির হয়ে যায়। বাড়িতে চিন্তা করে না?

—কে চিন্তা করবে? কেউ নেই।

—সে কী! কেউ নেই? একা থাকেন নাকি?

—না একা নয়। মা আছে। বোনেদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। ভাইও বিয়ের পর আলাদা হয়ে গেছে।

—আর আপনি বিয়ে করেননি?

—নাহ্। আমায় আর কে... বলে আচমকা থেমে গেল রিনা। কথাটা চেপে দেওয়ার জন্য পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারও নিশ্চয়ই দেরি হয় অনেক। বউদি চিন্তা করেন।'

—হে হে হে বউদি... হে হে।

—হাসছেন কেন?

—বিয়েই করিনি তো বউদি আসবে কোত্থেকে? এমনভাবে কথাটা বলল খেটো, যেন বিয়ে না করে একটা মহান কাজ করে ফেলেছে।

হাসল রিনা। তারপর বলল, 'আপনি কিন্তু বেশ ভালো মানুষ।'

—এই রে! কেন?

খাঁ খাঁ প্ল্যাটফর্ম। ডাউন লোকাল ট্রেনটা খানখান শব্দ করতে করতে এসে দাঁড়াল। খেটো আর মেয়েটা উঠল। কামরায় একটা প্রাণীও নেই। চট করে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল খেটো। উহ্। ট্রেন তো না। একেবারে ফুলশয্যার ঘর মাইরি!

—আমার নাম রিনা।

—আমি খে... ইয়ে গণেশ।

বলে আবার মেয়েটাকে মাপল খেটো। পরির ড্রেসগুলো এখন মেয়েটার কাঁধের ঝোলায় ভরা। সাদা ফ্রক আর লাইটিংয়ে মেয়েটাকে তখন যেমন ঝক্কাস লাগছিল, এখন অনেকটা লোডশেডিং খেয়ে গেছে। তবে মুখের মেকআপটা তোলেনি বলে গালদুটো অভ্রকুচিতে চিকচিক করছে যাত্রা করা মেয়েছেলেগুলোর মতো। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, চোখে কাজল। বেশ লাগছে কিন্তু! হাতের তালুদুটো আরেকবার ঘষে নিল খেটো। তারপর বলল, 'আমি তো প্রথমে বুঝিইনি যে আপনি মানুষ। ধরতেই পারছিলাম না কে আমাকে টাইম জিজ্ঞেস করছে! হে হে হে।'

রিনা হাসল। বলল, 'আসলে আমাদের পফেশনে ডিউটির সময় নড়াচড়া, কথা বলা একদম বারণ। পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

—বলেন কী! বাপরে বাপ। এ তো খুব কঠিন কাজ। এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন কী করে?

—প্রথমদিকে খুব কষ্ট হত। তারপর অনেকদিন টেনিং নিয়ে, যোগা করে এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

—মশাটশা কামড়ালেও নড়েন না?

—টের পাই না। পার্টির সামনে নড়লে ডিউটি পাব না।

—ওরে শ্লাহ। কী লোচার কাজ মাইরি!

রিনা হাসল, 'শুধু আমি নয়, যারা আমাদের মতো কাজ করে সব্বাইকে এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

—ও। তা সবাই কি আপনার মতো পরিই সাজে?

—না না। তা কেন, কেউ মিকি মাউস, কেউ রাজা, কেউ ভাল্লুক, কেউ জোকার—অনেক রকম সাজে।

—সব বিয়েবাড়িতেই?

—এই আমাকে চেনেন না, অথচ এত রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন।

—না না। এ আর এমন কী? আমারও তো একই দিকে বাড়ি। সেই জন্যই।

বলতে বলতে খেটো আরেকবার নিজের ঠোঁট চাটল। মেয়েটা নরম খাচ্ছে আস্তে আস্তে। গোটা বডিতে আরও একবার চোখ বোলালো খেটো। এমনিতে রোগা চেহারা। ভাঙা গাল। হাতের আঙুলগুলো কাঠি কাঠি। টানটান করে খোঁপা বাঁধা চুল। সবই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সালোয়ারের ওড়নাটা এমনভাবে চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে রেখেছে যে বুকের সাইজটা এখন মাপা যাচ্ছে না। তবে এদ্দিনের এক্সপিরিয়েন্স যা বলছে মাল খারাপ হবে না। জানলার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকার কাঁপিয়ে ট্রেনের ঝমঝম শব্দ। দুটো স্টেশন পেরিয়ে গেল। কেউ উঠল না।

খেটো গলা খাঁকড়ে বলল, 'কিন্তু টাকা ইনকাম করার তো অনেক রাস্তা ছিল। ও সব না করে খামোখা এই লাইনে এলেন কেন?' বলতে বলতে রিনার সামনে নিজের মুখটা খানিক এগোল খেটো।

প্রশ্নটায় ফিক করে একটু হাসল রিনা। আর সঙ্গে সঙ্গে খেটোর নাকে চিকেন কষার গন্ধ এসে ধাক্কা মারল। খাবারের প্যাকেট থেকে বেরোচ্ছে। খিদেটা মোচড় দিল আবার।

রিনা আরেকবার ওই গন্ধের উৎসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'একটা কারণে এসেছি। বলব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো... এই যাহ্... তুমি বলে ফেললাম!' বলে আবার ছোপ দাঁত বার করল খেটো।

—না না ঠিক আছে। তুমিই বলুন। বেশ একটা গদগদ ভাব নিয়ে বলল রিনা।

—আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, কারণটা শুনি।

বলতে বলতে নিজের সিট ছেড়ে রিনার পাশে এসে বসল খেটো।

রিনা খানিকটা অন্যমনস্ক। কিছু একটা ভাবছে।

উত্তেজনায় শীতশীত করছে। খেটোর হাতের তালু ঘামছে। শালা এতদিনের গ্যাপ। সেই জন্য এই হাল। আগে তো হারানের বিধবাটাকে এবেলা ওবেলা খেপ দিতেও টেনশন লাগত না।

'বলিই তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রিনা।

—আরে, আমি তো শুনব বলেই বসে আছি।

—আমার না সেই ছোট্ট থেকেই সাজগোজের খুব শখ। ইসকুলে গো এ্যাজ ইউ লাইকে প্রতি বছর ফার্স্ট হতাম। নিজেই সাজতাম।

—তাই নাকি? বাহ্। তা কী সাজতে?

—অনেক কিছু। আসলে দেখতে সুন্দর ছিলাম তো। যা সাজতাম মানিয়ে যেত। সবাই খুব হাততালি দিত। প্রাইজ পেতাম।

শুনে 'হে হে' করে হাসল খেটো। মন বসছে না গল্পে। টাইম পেরিয়ে যাচ্ছে এবার।

—হ্যাঁ। আমরা তো তিন ভাই বোন। বাবা লিলুয়া ওয়ার্কশপে কাজ করত। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে কারশেডের ওখানে লাইন পার করতে গিয়ে রেলে কাটা পড়ল। তখন কী অবস্থা আমাদের...!

এই কেলো করেছে! এতো রামায়ণ খুলে বসল মাইরি! কখন শেষ হবে? খেটো সংক্ষেপে 'হুঁ' বলল।

—বাড়িতে আমিই বড় মেয়ে। মা আর আমি মিলে একটা টিপ কারখানায় ঢুকলাম। কিন্তু ওতেও আর সংসার চলে না। তারপর কারখানার কয়েকটা ছেলে খুব পেছনে লাগত আমার। দেখতে সুন্দর ছিলাম তো তখন।

শুনে খেটো আবার তাকাল রিনার ওড়না ঢাকা বডিটার দিকে। তারপর বলল, 'সে তুমি এখনও সুন্দর আছ।' বলতে বলতে রিনার গা ঘেঁষে চেপে বসল ও। একটা হাত ছড়িয়ে দিল রিনার পিছনে। সিটের অপর আড়াআড়ি রাখল হাতটা।

—না না। মিথ্যে বলেছি না। মা কসম। ওই পরি সেজে যা লাগছিল না তোমাকে ফাটাফাটি।

—সত্যি বলছেন! রিনার গলায় বিস্ময়।

—আলবাত।

—যাহ্। বাজে কথা। নইলে কবে আমার বিয়ে হয়ে যেত। ওই অ্যাকসিডেন্টটার পরে আর ভালো দেখতে নেই আমি জানি।

'অ্যাকসিডেন্ট! কী অ্যাকসিডেন্ট?' একটু চমকাল খেটো।

—ওই একদিন স্টোভে রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ স্টোভটা বার্স্ট করল। আমি পুড়ে একশা। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম।

খুব ক্যাজুয়ালি বলল রিনা।

'পুড়ে!' শিউরে উঠল খেটো।

রিনার যেন কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই কিছুতেই। আপন মনে একা একাই খলবল করে বলে যাচ্ছে। সামনে যে খেটো বসে রয়েছে ওর খেয়ালও নেই বোধ হয়।

—খুব সুন্দর দেখতে ছিলাম তো। তাই বোধ হয় ভগবানের সহ্য হয়নি। দিল পুড়িয়ে। প্রাণে বাঁচলাম তো বাঁচলাম। এই গলা থেকে পেট পর্যন্ত পোড়ার দাগ আর উঠল না।

—পুড়ে গেছে...? সব...!

শব্দগুলো প্রায় আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এল খেটোর মুখ থেকে।

—সব পুড়লে তো মরে বেঁচে যেতাম একেবারে। না, এই গলা থেকে... বিয়ে আর হল না। কে করবে এই পোড়াকে? কী কাজ করব ভাবতে ভাবতে একদিন এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গেল এক জায়গায়। পরি সাজলে গলা থেকে হাত-পা সব ঢাকা থাকে... সেই ছোট্টবেলাতেও সাজতাম, আবার সেটাই শুরু হল। বেশ লাগে জানেন। সিজিনে মাস গেলে টাকাও আসে কিছু।

—এই তোমার ভয় করছে না তো? ভয়... করছে না তো?

কিছুক্ষণ থমকে রিনার দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বেশ জোরে চিৎকার করে বলে উঠল খেটো।

—না না। ভয় করবে কেন?

—হ্যাঁ। কিচ্ছু ভয়ের নেই।

আবার জোরে চিল্লাল খেটো, 'কোনও ভয় নেই।' এমন জোরে কথাগুলো বলল যে নিজের কানেই ফুটল বোলতার হুলের মতো। তারপর আচমকা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হন হন করে ট্রেনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

রিনা একটু যেন অবাক হয়েই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল খেটোর হাফপোড়া মুখটার দিকে। তারপর হঠাৎ বলল, 'ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কেন?'

—এমনিই।

—ওখানে দাঁড়াবেন না। ঠান্ডা লেগে যাবে। এখানে এসে বসুন। আসুন বলছি।

খেটো ভুরু কুঁচকে তাকাল রিনার দিকে। কেন কে জানে কথাটা শুনতে ইচ্ছে করল খুব। আবার এসে ওর পাশে বসল।

—এই সময়ের হাওয়াটা খুব খারাপ।

'হুঁ।' বলতে বলতে খেটো খেয়াল করল রিনা আবার একদৃষ্টে ওর খাবারের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। খেটোর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই একটু লজ্জায় যেন অন্যদিকে তাকাল রিনা।

খেটো বলল, 'এই তোমার খিদে পেয়েছে?'

—না না।

—আমি জানি পেয়েছে। খাওনি তো কিছু সন্ধে থেকে।

—ও কিছু হবে না। অভ্যেস আছে আমার। বাড়ি গিয়ে খাব।

—দেখো তো প্যাকেটটায় কী আছে?

—এই, না না।

—যা বলছি শোনো।

খেটোর গলায় কী ছিল কে জানে। মেয়েটা আর 'না' বলল না। হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা খুলল। খানিকটা ঠান্ডা বিরিয়ানি, একপাশে চিকেন চাপ, দুটো মাংসের ঝোলমাখা সন্দেশ আর একটা ন্যাতানো ফিশফ্রাই।

—খেয়ে নাও।

—তাহলে আপনাকেও কিন্তু খেতে হবে।

ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল রিনা। উত্তর না দিয়ে খেটো হাসল শুধু।

রিনা একমনে প্যাকেটের ওপরের কভারটা ছিঁড়ে খুব মন দিয়ে খাবার সাজাতে লাগল দুই জায়গায়। সিটের ওপর ওই সামান্য খাবারটুকু এমন মমতায় সাজাচ্ছিল যে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ খেটো যেন স্পষ্ট দেখতে পেল ডানাদুটো আবার মেয়েটার পিঠে এসে বসে গেছে। আসল পালকওলা দুটো ডানাই অল্প অল্প নড়ছে। কোত্থেকে আবার একটা নরম নীল হ্যালোজেন লাইট পড়েছে রিনার গায়ে। সেই ডানার হাওয়া লাগছে খেটোর গায়ে। ট্রেন কোথায় যেন ছুটে যাচ্ছে হু হু করে। বাইরে এক পৃথিবী অন্ধকার, ঠান্ডা হাওয়া আর তার মধ্যে খুউব ছোট দুটো আধপোড়া মানুষ আবার জ্বলে উঠছে একটু একটু করে। ❖

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখী ঝড়

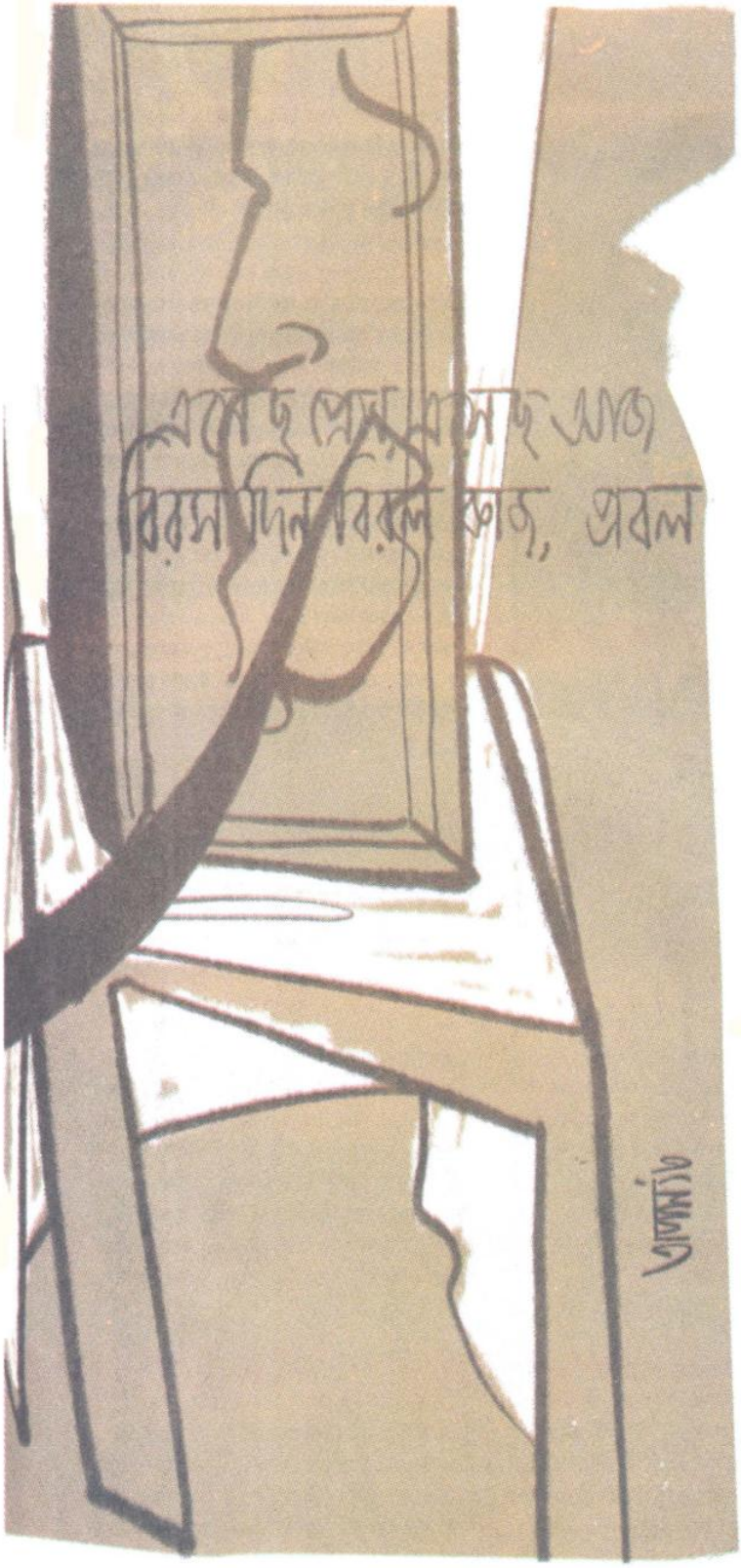

ম ণি দী পা ন ন্দী বি শ্বা স

হারমোনিয়ামের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে একটি শরীর। সাদা রিডগুলোর উপর ব্যস্ত আঙুল চলতে চলতে থেমে গেছে। ঢাকনা একপাশে খোলা, চিত করে শোয়ানো। স্বরলিপি, গীতবিতান চারদিকে ছড়ানো। ঘরটায় খোলামেলা আলোয় এককোণে তেপায়ায় রবীন্দ্রনাথ।

বড়, ছোট নানা আকৃতির, নানা রঙের। গম্ভীর বিপদ আঁকা মুখ। দাড়ি ঢাকা। উপরে নন্দলালের আঁকা কিছু ছবি, কতগুলো পোড়ামাটির ভাস্কর্য ভিড় করে আছে। মেঝেতে দাঁড় করানো বড় ভাস্কর্য কথা বলে যেন, ঘরে ঢুকলেই।

ঘরে বাইরে ফিসফিস। বাতাসেও ফিসফিস থেকে দাপট কালো হতে হতে আকাশ ঘিরে পাগলের মতো একটু আগেই ঝড়ের মাতন শেষ হল। গুমোট ভাব কমে গিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে আছে ওয়েদার অনেকটাই। মোবাইল মেঝেতে গড়াগড়ি। দরজা খুলতে পেরেছিল ওরা বহুকষ্টে। ভাগ্যিস জানলার আধফাটা পাল্লা দিয়ে তারকাঠি ঢোকানো গিয়েছিল। তা না হলে... এ শরীর... কী হত!

॥ ২ ॥

এ মাসে এই তিনদিন হল ফ্ল্যাটের ইলেভেন বি-র দরজার তালা খুলেছে। ঝাঁটপাট, কার্পেটের নতুন আভরণ, জানলা, দরজার পর্দায় সেজেছে ঘর। রবীন্দ্রনাথও পেয়েছেন জুঁইয়ের মালা। সদ্য ধূপকাঠি

পুড়ে পুড়ে সারা। একটুও মনে হচ্ছে না, সারাটি বছর প্রায়দিনই তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে এ দু'কামরার ছোট্ট ব্যালকনি বারান্দার ফ্ল্যাটখানা।

সবাই বলছে, মহিলা কোথায় কোন মফঃস্সলের বাসিন্দা। দু'মাস তিনমাস পরপর উনি এলেই আশপাশে সকলে উৎকর্ণ। গান শুনতে ছুটবে কেউ কেউ। এপাশ ওপাশ বারান্দা, জানলা ধরে উঁকি ঝুঁকি। মাঝে মাঝে মাঝবয়সি মহিলা কারও জেঠিমা, কারও কাকিমা, কারও বউদি... দরজা খুলে ওদের ভেতরে সোফায় বসায়। ওরা শোনে।

'আশ্চর্য। এখনও... ওরা শোনে ...বুঝলেন— রবীন্দ্রনাথ—' মিঃ গাঙ্গুলি বলছিলেন এ কথা, তিনি ফ্ল্যাটটির মালিক না প্রোমোটার বোঝার উপায় নেই। তদারকি করেন বেশ।

উনি বলছিলেন, 'বউদি দু'মাস অন্তর অন্তরই আসেন। কত কাজ করেন। কত লোকের আনাগোনা। বন্ধুরা এলে গান শুনতে আমরাও জুটি। ... আজ থেকে নাকি? সে তো হল... প্রায় পনেরো বছর। শুনেছি ওঁর দুই ছেলেরই চাকরি-বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা সম্প্রতি গত হয়েছেন। দুই ছেলে

একজন ব্যাঙ্গালোর, অন্যজন বুঝি স্টেটসে। অনেকবার নাকি মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এ ফ্ল্যাটখানা বিক্রি করে দিয়ে। বউদি তো শোনেননি ওদের কথা। একবার তো প্রোমোটারকে দিয়ে পার্টি ধরে এনে বিক্রির ব্যবস্থা প্রায় যখন পাকা, ফাইনাল টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া হবে... বউদি বিনা নোটিশে এসে উপস্থিত— সেই নর্থ বেঙ্গল থেকে। তারপর যা হয়, কান্নাকাটি, ব্যস ফ্ল্যাট বিক্রি বন্ধ। ছোটছেলে সেই যে গেছে... কলকাতায় আর দেখিনি। বড়ছেলে আসে। মাঝে মধ্যে টুকটাক কাজগুলো সেরে রেখে চলে যায়। জানলার পাল্লা বন্ধ হচ্ছে না, কিংবা, মা বলে দিয়েছে বলে একখানা কিচেন চিমনি বসিয়ে দেওয়া, কিংবা বাথরুমের ফ্লাশ কাজ করছে না, ঠিক করিয়ে রাখা, গ্যাস ওভেন এনে তার তদারকি করা... আর বছর বছর ট্যাক্সের কাগজপত্র ক্লিয়ার করিয়ে রাখা—এ সব। আর বউদি নিজে এসে ইলেকট্রিক বিল রসিদ সহ আমাকেই আজীবন দিলেন। আবার মেন্টেনেন্সের টাকা পয়সা তিনমাস অন্তর একবার দিয়ে দেওয়া— দাদা থাকতেও উনিই করেছেন। গৃহপ্রবেশের পুজোর দিন সেই যে দাদা এসেছিলেন, আর আসেননি। মাঝে মধ্যে, ফাঁক ফোকরে এলেও আমি দেখা পাইনি।'

'মহিলার বয়স কেউ বলতে পারেন?' ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করেন।

'কত হবে! ফিফটি ফাইভ... বড়জোর। সিক্সটিও হওয়া সম্ভব। বলতে পারছি না!'

—আচ্ছা! কখন থেকে দরজা খুলছেন না, বলবেন?

—অ্যাঁ... হ্যাঁ—হ্যাঁ—উনি ভোরবেলাতেই উঠে পড়েন। হাঁটতে হাঁটতে একগাদা খবর কাগজ কেনেন। তারপর টুকটাক বাজার করেন। কিন্তু প্রতিদিন যেটা কেনেন, বড় রজনীগন্ধা আর গ্ল্যাডিওলাস বা কলাবতীর স্টিক। আর লম্বা একখানা জুঁই বা গোরের মালা।

—আচ্ছা!

'হুঁ! রবীন্দ্রনাথের গলায় দেখুন। আজও পরানো রয়েছে। পাশে কাচের ফ্লাওয়ার ভাসে টাটকা জল। এখনও রজনীগন্ধার গন্ধ বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ কী যে হল মানুষটার...' কেয়ারটেকারের বউ রুমনি কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

।। ৩ ।।

আসলে প্রোমোটার মিঃ গাঙ্গুলি কোনও রিস্ক নেবেন না। পুলিশে খবর দিয়েছেন। না দিলেও চলত। সবাই জানে হার্ট অ্যাটাক। তবু... ভদ্রমহিলা স্বাবলম্বী, সাবধানি, আর বড় স্বাধীনচেতা। গোঁড়ামির নামমাত্র নেই, যতটুকু দেখেছে এখানকার মানুষজন... সকলেই জানে, মাঝ বয়সিরা বা অল্পবয়সি বড় মেয়েরা সামনের মন্দির বাজার থেকে পুজোর ফুল প্যাকেট করে নিতে ব্যস্ত, উনি তখন দর করছেন, ফুলের দোকানে লাল গোলাপ আর রজনীগন্ধার কিংবা জুঁইয়ের মালার। সকলে জেনে গিয়েছিল ধীরে ধীরে—এ মালা কবির।

পঁচিশে বৈশাখ/ বাইশে শ্রাবণ... বন্ধুসমাগম হত। এই ফ্ল্যাটে, এখানেই। 'আগে তো কয়েকবার সদন বা মধুসূদন মঞ্চেও গান গেয়েছেন অনুরাধা বউদি'।

দু'জন মিলে গেয়েছিলাম মধুসূদন মঞ্চে। তুমি আর এলে না কেন দেবব্রত! আমি অন্য কারও নই। বার বার বলেছি তো! আমি বিয়ের আগে ভালোবাসিনি, বিয়ের পরেও না। আমি ভালোবেসেছিলাম ওদের, আমার সন্তানদের।

বলেন মিঃ গাঙ্গুলি।

'হুঁ! কী নাম বললেন? অনুরাধা...অনুরাধা রায়। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জনে বোঝা যায়, অনেকেই জানে এই নাম। গান শুনেছে অনেকে। সিডির গান। ওই তো তে-কোনা র‍্যাকটিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির ঠিক নীচে, রাখা আছে ভেঙে চুরে যাওয়া, ধুলোয় পড়া সিডিটা। আরও দুটো অনেকটা নতুন কভার মোড়া সিডি। ইনসপেক্টর হাতে তুলে নেন। উচ্চারণ করেন, 'হাউ স্যাড!'

।। ৪ ।।

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে

এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।

দু'জন মিলে গেয়েছিলাম মধুসূদন মঞ্চে। তুমি আর এলে না কেন দেবব্রত! আমি অন্য কারও নই। বার বার বলেছি তো! আমি বিয়ের আগে ভালোবাসিনি, বিয়ের পরেও না। আমি ভালোবেসেছিলাম ওদের, আমার সন্তানদের। ওদের

নিয়ে মাদকতায় কত দিন, কত রাত একা কাটিয়েছি! কত বড় হয়েছে! জানো, সন্তান বড় হয়ে ওঠার এক যন্ত্রণা আছে! আবার একা হয়ে যাওয়া—আবার একলা মানুষের গান। আমার সঙ্গী তখনও রবীন্দ্রনাথ। এখনও। তুমি এলে—সেই এক ঝড়ের রাত। তুমি কোথায় কোন হলদিয়ায়- না কি কলকাতার প্রান্তেবাসী এক যুবক। আমি কোন উত্তরের মফস্বলের শেয়াল রাজার কন্যে... গান গাইতে গাইতে কখনও দৌড়োচ্ছি এ প্রান্তে, কখনও ও প্রান্ত! কী হল বলো তো সেদিন... সেদিন ছিল কবিপক্ষের বিশেষ একদিন। গানে গানে ভুবন ভরেছিল। তোমার গান ছিল না। সামনের সারির নিবিষ্ট শ্রোতা—মন দিয়ে শুনছিলে গান। তুমি জানতেই না, এক জোড়া চোখ তোমাকে পরখ করেছিল সেদিন। গান শেষে নামতেই তুমি এসে দাঁড়ালে। আর্য শরীর, আর্য রূপ, আর্য রক্ত শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেই পড়েছি। নেমে এলে, কোন কাননের ফুল হয়ে বলো তো! সে পৃষ্ঠা থেকেই... কথা বলেছিলে। হাত ধরেছিলে... গানের কথা বলছিলে... আমার কানেই যাচ্ছিল না। শুধু বুঝেছিলাম, ভালো লেগেছে গান। মনে হয়েছিল, একেই তো স্বপ্ন দেখেছি! ঠিক এইরকম। ধারালো সৌন্দর্য। তোমার কথাগুলো আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, তোমার গলায় গান আছে, বুকের মধ্যেও তার অনুরণন।

নেমন্তন্ন করে দিলাম। মনে আছে তোমার! পরের মাসে আমার কলকাতার বাড়ি জমজমাট। জমজমাটি দুপুরের পর মিটে গেল। সকলে চলে যেতে... শোনালে ঘরে বসে একের পর এক তোমার গান। হারমোনিয়াম বাজাব কী গো। আমি তো সুরে তখন ডুবে আছি! তারপর তোমার প্রিয় গানগুলো একসঙ্গে কতবার গেয়েছি... বার বার ...ফাল্গুনের, প্রেমের... উঃ। আগুন হয়ে ধরা দিয়েছিলে। জেনেছিলাম, তুমি একা। মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ একা। সন্তানহীনতার ব্যথা আছে তোমার। আমার মনে হল, পূর্ণ তুমি। সন্তান থাকা, সন্তান ধারণের কষ্ট আছে, পীড়া আছে, সে পীড়া সময়ের সঙ্গে বদল হয়। তোমাকে বলেছিলাম। তুমি কী বুঝেছিলে জানি না...

শুধু গেয়ে উঠেছিলে খোলা গলায়— 'যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ওই বিজয় রথ, / আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘন ঘুমের মোহে।'

সেই বিরস দিনের নির্জন কাজের মাঝখানে কখন শুধু তুমিই রয়ে গেলে আমার ধ্রুবতারা হয়ে! সন্তান স্নেহ, আর এ মায়া যে আলাদা। হুঁ-ভালোবেসে ফেললাম কখন...।

তুমি কিন্তু সে ভালোবাসা দিতে পারোনি আমাকে, আমি জানি। মাঝে মাঝে বিতৃষ্ণও হয়েছ! ভেবেছ, এ কী। এ কি 'মা'। কারণ, তুমি, তোমার মত সবাই ভাবে মা হয়ে সান্ত্বনা মানেই নিজস্ব ইচ্ছেগুলো শুধুই ওদের জড়িয়ে জড়িয়েই বেড়ে উঠবে। ওদের ইচ্ছের মত মায়ের ইচ্ছেও কখনও এদিক কখনও ওদিক করবে। হুঁ! সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার অস্বাভাবিক ব্যাপার এটাই। এতগুলো বছর পর

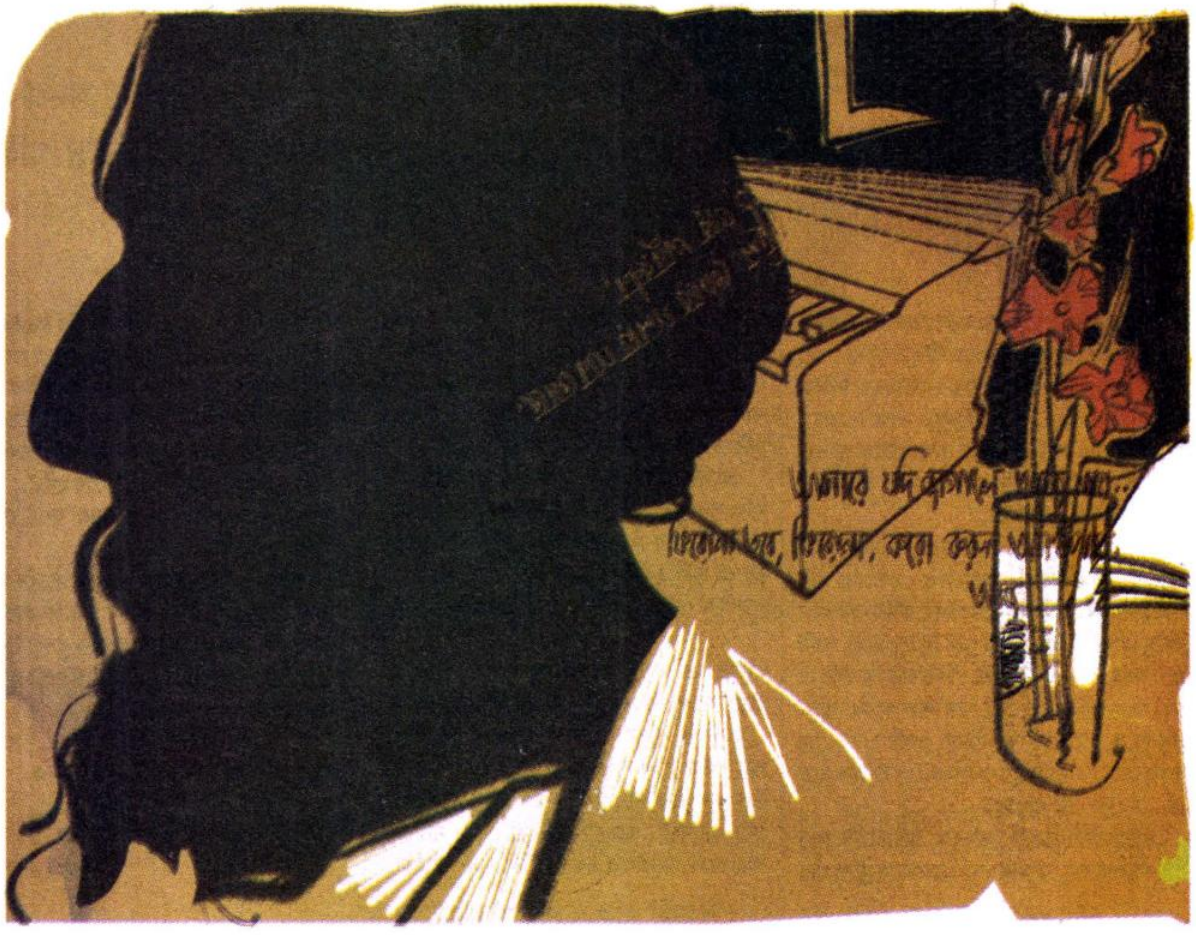

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান নিয়ে একই জায়গায় পুরুষোত্তম। আর তোমাকে আবিষ্কার—মনের ঘরে চুপি চুপি ঢুকে যাওয়া—এড়িয়েছ। এড়িয়ে যাবে কোথায়! প্রবল টানে আবার এসেছি। আবার... মঞ্চে গান করেছি দু'জনে। সিডি সেদিন বেরোল, সেটাও তো এমনি এক বৈশাখী রাত। কালবৈশাখী উঠেছিল সেদিনও। তোমাকে থাকতে বলেছিলাম বার বার। শোনোনি। 'কখনও তা হয় না।' বলেছিলে। সত্যি। হয় নাকি!

নন্দনের কাছে তোমার অফিসের চেয়ারে যেদিন তোমাকে দেখেছিলাম, আর তথ্য সংস্কৃতি বিভাগেই...। আমি অবাক না হয়ে পারিনি, এত ভালো কণ্ঠ নিয়ে নিজে একটিও অনুষ্ঠান না করে সকলকে সুযোগ করে দেওয়া! একেই কি সৎ চাকুরে বলে! আচ্ছা, তোমার মতো আর সবাই যদি একটুখানিও হত! হয় না। আমিও পারতাম না। জানি না সে চেয়ার কীভাবে চালাতো আমাকে!

দেবব্রত, সিডি প্রকাশের পরই আর তোমাকে পেলাম না। সেদিনও তো এমনই কালো রাত—এরকমই ঝড়। তুমি ফোন বন্ধ করে দিলে। ভাবলে

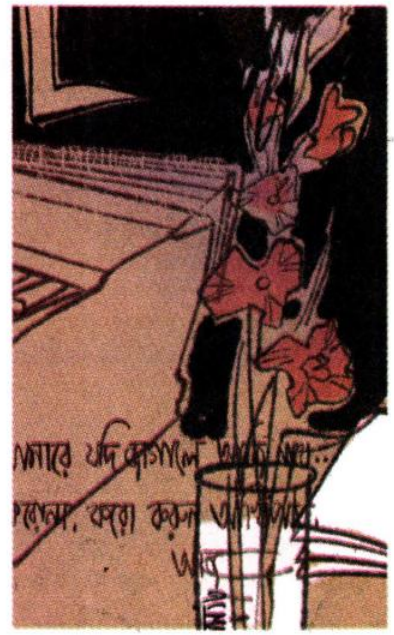

আজও তেমনই রবীন্দ্রনাথ বসে আছে। প্রথম জুঁইয়ের মালা তুমি পরিয়েছিলে, আমি প্রতি বছর, আজও পরিয়েছি... কিন্তু গাইতে পারি না যে। আর, তুমি চলে গেছ গান সাঙ্গ করে।

বুঝি অনুরাধা রায়ের নামের সঙ্গে তোমার নাম জুড়ে যাচ্ছে অদ্ভুত কৌশলে। তাতে কী? জানি না। সেই যে অদ্ভুত কালো ঝড়ের রাত—তোমাকে নিবিড় করে পাওয়ার রাত... সে ইচ্ছেটুকু এ শ্রাবণেও আছে বলেই এখনও গাই... চোখের জল আটকে রাখতে পারি না। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার/ পরাণ সখা বন্ধু হে আমার...'

এতগুলো বছর, প্রতি বৈশাখে, শ্রাবণে আমি এসেছি। গান বাইরে ফুরোলেও ভেতরের গান কেড়ে নেবে কে! আজও তেমনই রবীন্দ্রনাথ বসে আছে। প্রথম জুঁইয়ের মালা তুমি পরিয়েছিলে, আমি প্রতি বছর, আজও পরিয়েছি... কিন্তু গাইতে পারি না যে। আর, তুমি চলে গেছ গান সাঙ্গ করে। 'গানে সব ভুলে থেকো'— বলেছিলে একদিন। সে তো হওয়ার নয়। একরাশ বুকের কান্নাগুলো আটকে ধরে যে... সুর। ও পথ পায় না।

ছোটছেলের কাছে ফেসবুক, ইন্টারনেট করা শিখেছিলাম শুধু তোমার জন্য। তোমাকে খুঁজে পাব বলে... তোমার প্রোফাইল বেরোল। ছবি এল, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট সব হল। কিন্তু... তারপর সব স্তব্ধ। তোমার সংসার, তোমার আকাঙ্ক্ষা... চড়ুই পাখির ডানা ধরে উড়তে শেখানোর ইচ্ছে নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল বল তো।

ছেলেরা চলে গেছে। আমি একাই আসি। চেষ্টা করি, সুর তুলি... আসলে তোমাকে খুঁজি, মনে মনে ডাকি। আমার বিশ্বাস আজও, এই রকম ঝড়ের রাতেই তুমি একদিন আসবে।

।। ৫ ।।

এটুকুই। তারপর... কলমের ঢাকনা পড়ে আছে দূরে। ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলো বাতাসে কেঁপে উঠছিল।

অনুরাধা রায়ের বড়ছেলে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টে যায়। লেখাগুলো ঝাপসা হতে হতে হারমোনিয়ামের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা শরীর সোজা করে শুইয়ে দেয় কার্পেটে। ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ। সাগরের কান্নাগুলো অনুরাধার একাকিত্ব নিয়ে চলে যাওয়া... দূর করতে পারে না।

বাবার পরামর্শে তথ্যসংস্কৃতির উচ্চপদস্থ অফিসারটিকে তীব্র অপমান করেছিল সেদিন অনুরাধা রায়ের বড় ছেলে সাগর রায়। ফেসবুক থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল ওর প্রোফাইল।

পেরিয়ে গেছে কতগুলো বছর। মাকে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে চিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছিলেন যিনি, মনে মনে ভুগতে থাকা মানুষটি সাগরের বাবা। তিনি তো হার্ট-অ্যাটাকে কবেই চলে গিয়েছেন। অনুরাধা চিকিৎসা করাননি। ওর প্রয়োজন ছিল না। সুস্থ স্বাভাবিক মনে ভালোবাসা চেয়েছিল শুধু। সাগরের এ কান্না আজ কার জন্য! মায়ের বুঝি প্রতীক্ষার শেষ হয়েছিল। তাই আর বাঁচতে চাইল না সে। বুকের কাছে মুঠি করে ধরে থাকা খবর কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা বাঁ হাত থেকে খুলে নিয়েছিল সাগর। সেখানে ছবি আর খবর।

... দেবব্রত মুখার্জি... ওঁর আত্মার শান্তি কামনায়—অসীমা মুখার্জি (স্ত্রী)।

মৃত্যুসময়ে মায়ের কি ঠিক এইরকমই যন্ত্রণা হয়েছিল ঠিক যেমন সাগরের বুকের কোণের দিকে ব্যথা করে উঠছে এখন। না কি আরও দগ্ধতার...

নিমতলা শ্মশানের কথাই মায়ের কাছে শুনেছিল সাগর। গাঙ্গুলি সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছিল।

মেডিক্যালের রক্ষী একখানা খাম দিয়ে গেল গাঙ্গুলির হাতে। ইন্সপেক্টরের কাছ থেকেই খবর চলে গেছে। এই মুহূর্তে সে খাম সাগরের হাতে...

অনুরাধা রায় স্বেচ্ছায় দেহদান করে গেছেন মেডিক্যাল কলেজে।

একটুকুও ফাঁক নেই। কারও জন্য বাড়তি ভাবনা বাড়তি কাজের সুযোগ রেখে যাননি অনুরাধা। শুধু এনআরএস-এর সাদা অ্যাম্বুলেন্সকে একটুখানি দাঁড় করিয়েছিল সাগর। বাজিয়েছিল মন্ত্র পাঠের বদলে মায়ের সিডি—

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ... ফিরো না তবে, ফিরো না, কর করুণ আঁখিপাত। ❖

অলঙ্করণ : তাপস মণ্ডল

বসন্ত উৎসব

ঋ ত ব্র ত ভ ট্টা চা র্য

সঙ্গীতভবনের পাশে রঞ্জনদার ক্যান্টিন কলকল্লোলে জমজমাট। মেয়েলি উচ্চস্বরে হাসি, সুরেলা কণ্ঠে রসিকতা আর সমস্বরে এক ঝাঁক মহিলাকণ্ঠের ধ্বনিতে গোটা ক্যান্টিন মুখরিত।

চার

কলকাকলি হোস্টেলের সোহিনী, বেদবতী, মধুশ্রী, ঈশিতা। কাকলিদের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে ঋতৃণ। ব্যতিক্রম শুধু শুভশ্রী। রঞ্জনদার স্ত্রী অর্থাৎ আপামর সঙ্গীত ভবনের বউদির সঙ্গে কী একটা বিষয় নিয়ে সে যেন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

আসলে শুভশ্রীর কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগছে। কিছুটা তো অভিমান বটেই। ঋতৃণকে নিয়ে বেদবতীরা এমন একটা করছে যেটা বাড়াবাড়ি বললেও কম বলা হয়। কী দরকার এমন গায়ে পড়ার! না হয় সে নামী রিপোর্টার। সবাই তাকে চেনে। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েদের আদেখলাপনা দেখে মনে হচ্ছে যেন ওর অপেক্ষাতেই ওরা এতদিন বসেছিল। ঋতৃণকে দেখে যদি এমন করে

এরা, তাহলে উত্তমকুমারকে দেখলে কী করত?

কিন্তু সবার মধ্যে শুভশ্রী কিছু বলতেও পারছে না। আসলে ঋতৃণকে এতটা আমল দেওয়াটাও তার কাছে বাধো বাধো ঠেকছে। কিন্তু সবার মধ্যে তো আর গোমড়া মুখ করে বসে থাকা যায় না। তাই কিছুটা বাধ্য হয়ে যে গল্প না করলেও চলত নেহাত সময় কাটানোর জন্য সেই গল্প সে ফেঁদে বসল বউদির সঙ্গে।

এদিকে চা-টা আর গল্পে মেয়েরা দারুণ খুশি। ঋতৃণেরও আটটার লাইভ চ্যাটের জন্য কোনও ঝামেলা থাকল না। ঘড়িতে সময় প্রায় পৌনে আটটা। সুতরাং লাইভের জন্য এবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়। হই চই করে মেয়েরা সবাই লাইভ দিতে চলল। একমাত্র বেঁকে বসল একজনই। 'কলকাকলি' হস্টেলের সবচেয়ে মিষ্টি, ভদ্র আর মার্জিত স্বভাবের মেয়েটি। শুভশ্রী। ঋতৃণের সবিনয় আবেদন প্রত্যাখ্যান করল সে। সাফ জানিয়ে দিল 'আর নয়'। সুনেত্রাদির নির্দেশে সে সকাল সাতটার লাইভ দিতে এসেছে। আটটার লাইভের কথা তো তিনি বলেননি। অন্যরা দাঁড়ালে তার অবশ্য কোনও আপত্তি নেই। তবে সে নিজে আর মুখ দেখাতে চায় না।

ঋতৃণ বুঝল শুভশ্রীকে রাজি করানো তার কম্ম নয়।

বৃষ্টি নামার আগে

মোহনা-অগ্নি-অরণি-সুস্মিতারা দারুণ আড্ডায় মশগুল। আড্ডার মধ্যেই চমৎকার গরম গরম লুচি আর সাদা আলুর তরকারি নিয়ে এল এবাড়ির রাঁধুনি বেনুদা। সঙ্গে এক রাউন্ড চা-ও হল। এমন সকালে কি গান না হলে চলে! এই বাড়িতে বোধহয় প্রায়ই গানবাজনার আসর বসে। একটা ইলেকট্রিক তানপুরা সোফার তলে ঘাপটি মেরে পড়েছিল। বছর চারেকের সুস্নাত ওটাকে খেলার গাড়ি ভেবে বার করেছিল। আপাতত ওটাকে মুছে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে। সবার অনুরোধে মোহনা গান ধরল। ওর প্রিয় গান—

'প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান
মোরে আরো আরো দাও প্রাণ'।

রবি ঠাকুরের প্রতিটি গানের গভীরে একটা দর্শন থাকে। এক একজন বোধহয় এক এক রকমভাবে তা উপলব্ধি করেন। হঠাৎ-ই অগ্নির মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা। বসন্ত থেকে মুহূর্তে সে ফিরে গেল এক ঘোর ঘন বর্ষায়। দক্ষিণ কলকাতায় মোহনার বাপের বাড়িতে। সেবার মোহনার বাবা-মা চেক-আপের জন্য দক্ষিণে গিয়েছেন। মুশকিল হয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে চিঠি মারফত দু'সপ্তাহ আগে জানানো হয়েছে, কর সংক্রান্ত কারণে জরিপ হবে ওদের লেক গার্ডেন্সের বাড়ি। তারপর ঠিক হবে নতুন হারে কর। এই কারণে তো আর মেডিক্যাল চেক-আপ বন্ধ করা যায় না। কর্মসূত্রে মোহনার ভাই থাকে মুম্বইতে। সব জানার পর নিজের থেকেই এই দায়িত্বটা নিয়ে নিয়েছে মোহনা। বাবা-মাকে বলেছে নিশ্চিন্তে যেতে। সব কিছু সেই বুঝে নেবে। প্রথমে ভেবেছিল কাজটা এমন কিছু নয়। কিন্তু যতই সেই জরিপের দিন এগোচ্ছিল ততই মোহনার মনে হল ব্যাপারটা আদৌ তেমন সহজ নয়। অরণিকে বলেছিল ওর সঙ্গে থাকতে। কিন্তু সেদিনই মুম্বই-এর এক নামী সেলিব্রিটির কলকাতায় আসার কথা। তার ইন্টারভিউ নিতে

হঠাৎ-ই অগ্নির মনে পড়ে গেল সেই দিনের কথা। বসন্ত থেকে মুহূর্তে সে ফিরে গেল এক ঘোর ঘন বর্ষায়। দক্ষিণ কলকাতায় মোহনার বাপের বাড়িতে। সেবার মোহনার বাবা-মা চেক-আপের জন্য দক্ষিণে গিয়েছেন।

হবে অরণিকেই। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত অগ্নির দ্বারস্থ হল মোহনা।

এখনও চোখে সেই বর্ষণমুখর বিকেলটা লেগে আছে অগ্নির। দুপুর দুপুর চলে এসেছিল ওরা মোহনার বাবা-মার লেক গার্ডেন্সের বাড়িতে। জরিপের লোকজন আসার কথা শেষ দুপুরে। ইচ্ছে করেই ওরা তাড়াতাড়ি চলে এল। এই প্রথম খালি বাড়িতে ওরা দু'জনে। অগ্নি যে মোহনাকে একা পেয়ে একটুও হ্যাংলামি দেখায়নি তা নয়। কিন্তু মোহনা অগ্নিকে বেশ কড়া শাসনে রেখেছিল।

গৃহনিপুণা মোহনার বাপের বাড়িতে বেশি আসার সময় হয় না। এসেই বাবার পড়ার ঘর গোছাতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাত লাগাল অগ্নিও। বেশ লাগাছিল একসঙ্গে কোনও কাজ করতে।

মনে হচ্ছিল যেন কোনও সদ্য বিয়ে হওয়া দু'জন তাদের ঘর গোছানোতে ব্যস্ত। বাবার ঘরে বই সাজাতে সাজাতে হঠাৎ-ই বেরিয়ে পড়ল একটা অ্যালবাম। ছোট বেলার কত ছবি। ব্যাস! ঘর গোছানো মাথায় উঠল। মোহনা, অগ্নিকে চেনাতে শুরু করল তার ছোটবেলার মানুষজন, ঘর, বাড়ি, মোহনার প্রথম শাড়ি পরা...

অ্যালবাম দেখতে দেখতে কখন যে দু'জনে কাছাকাছি চলে এল! দীর্ঘ চুম্বনের পর আরও হয়তো এগোত অগ্নি। কিন্তু মোহনা নিজেকে সংযত করল। স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদীকে বাঁধ দিলে যেমন হয়। ভালোবাসা অনেকটা স্রোতের মতন। জোর করে কিছু করলে তার ছন্দ কেটে যাওয়ার ভয় থাকে। ভালোবাসাকে সময়ের উপরে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। অগ্নিও মোহনার বাধা মেনে মিল নীরবে।

সেদিন মোহনা রান্না করে অগ্নিকে খাইয়ে ছিল। বাড়িতে যা ছিল তা দিয়েই। পদ খুব সাধারণ। তবে অমৃতের মতো লাগছিল অগ্নির। ডাল, ভাত, ঘি, আলুভাজা আর ডিমের ডালনা। আসলে রান্না তো হয় দরদের আঁচে। যা মোহনার রান্নায় ছিল ষোলো আনার জায়গায় আঠেরো আনায়।

খেয়ে উঠতে উঠতেই বেলা তিনটে বেজে গেল। অগ্নি হাত ধুতে ধুতেই কলিংবেল বেজে উঠল। জরিপের লোকজন এসে পড়ল। সব কিছুই সামলাল অগ্নিই। মাঝে মাঝে ফিসফিসিয়ে অগ্নির কানে কানে মোহনা বলছিল কোন ঘরে সে ছোটবেলায় থাকত। কোথায় ওর ঠাম্মা থাকতেন। কোথায় সে পড়তে বসত। আসলে ঘর-বাড়ি মানে তো শুধুই কংক্রিটের দেওয়াল, দরজা-জানলা নয়। পুরোনো বাড়ির প্রতিটি ইটের গায়ে কত স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। থাকেন জীবিত-মৃত কাছের মানুষেরা। থাকে সুখ- দুঃখের কত ঘটনা।

তারপর জরিপের লোকজনও যথাসময়ে মাপজোক সেরে ফেললেন। তারা অবশ্য ওদের দু'জনকে স্বামী-স্ত্রী-ই ভাবছিল। মোহনা বা অগ্নি কেউ ভুলও ভাঙায়নি। হয়তো দু'জনেরই বেশ লাগছিল। ওঁরা ওদের কাজ করে চলে গেলেন। অমন একটা বাদল বিকেলে এমন নির্জন নিভৃতে প্রেয়সীকে ছাড়ার মতন রসকষহীন প্রেমিক কি অগ্নি! মোহনা যে একটু আমতা আমতা করছিল না তা নয়। তবু সে সব 'না' অগ্নির এক আবদারে উড়ে গেল। বাইরে তখন গোধূলিসন্ধির আলো ঢেকে ঘন কালো মেঘ। ঠান্ডা মৃদু হাওয়া বইছে। মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীটা যেন শান্ত হয়ে পড়ছে। তারপর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা। এক প্রচণ্ড ঝড় ধেয়ে এল দক্ষিণ কলকাতায়। প্রথমেই শুরু হল ধুলোর ঝড়। রাস্তার এক মুঠো ধুলো ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল লেক গার্ডেন্সের চল্লিশের বি'র মোহনার বাপের বাড়ির দক্ষিণের জানলার দিকে।

ওদিকে ঝড়ের চোটে নির্জীব বাড়ি যেন প্রাণ পেয়েছে। এলোপাথাড়ি জানলার পাল্লাগুলো যেন অশান্ত পাখির ডানার মতন ঝাপটা দিচ্ছে। জানলা বন্ধ করতে ছুটে গেল মোহনা। জানলার কাছে গিয়ে পাল্লার আঙটার নাগাল পেতে পেতেই মোহনা অনুভব করল অগ্নির নাগালে সে এসে পড়েছে। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে অগ্নি। তার ঘাড়ে অগ্নির উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে। অগ্নির দুই হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তার বুকের দিকে। ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর এক ঝড়। সব কিছু বাধাবন্ধন সেই ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল। কলকাতার এই অংশে হঠাৎ-ই ঝড়ে বিদ্যুৎ বিপর্যয়। নেমে এল অন্ধকার। অগ্নির আদরে অস্থির মোহনা। এত ভালোবাসা, এত আদর এতদিন কোথায় ছিল? ঢেউয়ের মতন অগ্নি যেন মোহনাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। সমস্ত লজ্জা, বাধা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এক অন্য মোহনা যেন জেগে উঠেছে। সেই মোহনা সদ্য ফোটা শিউলির মতন সতেজ, পূর্ণ সূর্যমুখীর মতন রঙিন আর মায়াবী। সে আদরের প্রত্যুত্তর দিতে জানে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের আবার জয়। অগ্নির প্রতিটা ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দিল মোহনা। যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে দুটো শরীর যেন তালে তালে মিশে যাচ্ছে, ছন্দে ছন্দে কেঁপেও উঠছে নিখুঁত। মনে হচ্ছে এই মিলনের জন্যই বাৎস্যায়নের এত পরিশ্রম। অগ্নির চোখ তখন মোহনাকে অবিষ্কারের নেশায় অস্থির। কিন্তু মোহনার শরীর হৃদয় তখন একটাই কথা বলছে। তার জীবনে ভালোবাসার সঠিক মানুষটিকে আজ সে সব দিচ্ছে। যেমন সর্বস্ব দিয়ে মানুষ তার পুজো দেয়, তেমন করেই নিজেকে উজার করে মেলে ধরেছে মোহনা। নাও আমায় গ্রহণ করো অগ্নি। আমি শুধু তোমার। তুমিই সেই মানুষ, যার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। দুটো শরীর কখন যে নিজেদের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল...

ঝড় শান্ত হল। মুষলধারে বৃষ্টি এখন টিপ টিপ। নগরের চারপাশে ভেজা গন্ধ। অগ্নির বুকে মাথা রেখে মোহনা। মোহনার আঙুল বিলি কাটছে অগ্নির লোমশ বুকে। বড় অলস মুহূর্ত। পৃথিবীর সময় এখন যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। এক অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে এসেছে দু'জনের শরীর-মনে।

দক্ষিণের জানলা আর বন্ধ করে উঠতে পারেনি ওরা। ঝড় তখন উঠেছিল এই মানব-মানবীর দেহে-মনে। আর সেই সুযোগে ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি উঁকি মেরেছিল ওদের ঘরের ভিতরে। দক্ষিণের হাট করে খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ভিজিয়ে দিয়েছে ওদের মেঝে।

তারপর একসময় মোহনা আশ্চর্য আলস্যের মায়া কাটিয়ে উঠে খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গেল। মোহনা নগ্ন শরীরে

অ্যালবাম দেখতে দেখতে কখন যে দু'জনে কাছাকাছি চলে এল! দীর্ঘ চুম্বনের পর আরও হয়তো এগোত অগ্নি। কিন্তু মোহনা নিজেকে সংযত করল। স্রোতস্বিনী পাহাড়ি নদীকে বাঁধ দিলে যেমন হয়।

ভেজা মেঝের উপর দিয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে এগিয়ে চলেছে। সে গিয়ে দাঁড়াল জানলার গ্রিল ধরে। যতদূর চোখ যাচ্ছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কংক্রিটের শহর। মেঘ সরে যাওয়ার পর আকাশেও নেমে এসেছে প্রশান্তি। দূরে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশ। একটা, দুটো করে তারা ফুটছে। তন্ময় হয়ে মোহনা তাকিয়ে আছে। অগ্নি এসে দাঁড়াল মোহনার পাশে। ঠিক সে সময় দূর থেকে লোডশেডিংয়ে নিকষ কালো অন্ধকার নগরের বুক চিরে আলো আসছে। দেখতে বেশ লাগে। মুহূর্তে মুহূর্তে আলো এগিয়ে আসে ওদের দিকে।

এসব ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কেটে গেল অগ্নির। সবার মধ্যে থেকেও এক অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছিল সে। সেই জগৎটার কেন্দ্রে শুধুই মোহনা আর মোহনা। তখনও কি অগ্নি জানত বসন্তের আকাশ ক্রমেই বদলাচ্ছে?

এদিকে ঋতুণের লাইভটা দারুণ হল। শুভশ্রী অবশ্য রঞ্জনদার ক্যান্টিনে বসেছিল। এই লাইভে সে ছিল না। লাইভ শেষ করে ঋতুণ এসে বসল শুভশ্রীর পাশে। যেন কিছুই হয়নি।

একটা স্টিল কালারের দামি বিলাসবহুল গাড়ি ছুটে আসছে শান্তিনিকেতনের দিকে। গাড়ির পিছনের সিটে বসে এক সুদর্শন মহিলা। পরনে দামি অথচ মার্জিত লাল-কালো তসর সিল্কের শাড়ি। গাড়ির খোলা জানলায় চুল উড়ছে। হাতে ইংরাজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি। গাড়ি চালাচ্ছেন উর্দি পরিহিত এক ড্রাইভার। মহিলাটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি সুন্দরী, আভিজাত এবং অবশ্যই ধনী। বয়স ত্রিশের মধ্যেই। গীতাঞ্জলির পাতা মাঝে মাঝে ওল্টাচ্ছেন বটে কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তার চোখ জানলার বাইরে। দৃষ্টিটা কেমন জানি উদাসীন। গাড়িটা এগিয়ে এসে যে মোড়টায় দাঁড়াবে সেখানে সেই সময় শালপাতা মোড়া এক গুচ্ছ পলাশ ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল। নীল সবে ওর পিএইচডি শুরু করেছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বান্ধবীদের জন্য ঝরে পড়া পলাশ ফুল নিতেই এদিকটাতে আসা। তার সাইকেলের টায়ারটার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বাসে এসেছিল। পলাশ পাওয়ার পর প্রায় আধঘন্টা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে। বোকার মতন হাতে একগুচ্ছ পলাশ ফুল নিয়ে একটা ছেলে আর কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে। মেজাজটা একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে! মোড়টার আরেকটু কাছে এসে গাড়িটার গতি কমিয়ে দিলেন ড্রাইভার। এবার রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন রাস্তাটা ধরব ম্যাডাম? ম্যাডামের মুখ দেখে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তিনি ঠিক জানেন না।

ওই যে মোড়ে একটু জিজ্ঞেস করে নিন। নীলের সামনে এসে গাড়ি থামালেন ড্রাইভার।

— দাদা শান্তিনিকেতন কোন দিক দিয়ে যাওয়া যায়? এমনিতেই নীলের মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছে। বাসের নামগন্ধ নেই। তবু ড্রাইভারটার প্রশ্ন শুনে ইচ্ছে করেই একটু বাঁকা উত্তর দিল সে—সে তো শান্তিনিকেতন সব দিক দিয়েই যাওয়া যায়।

এমন ভাবে নীল বলল যেন 'অল রোডস লিড টু রোম।' বলে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল নীলের।

গাড়ির ভিতরে বসে থাকা মহিলা বোধহয় একটু বিরক্তই হলেন। তিনি একটু ঝুঁকে জানলা দিয়ে নীলের দিকে তাকালেন। মহিলার সঙ্গে নীলের চোখাচুখি হল। হঠাৎ নীল কেমন জানি সতর্ক হয়ে গেল। হয়তো মহিলার ব্যক্তিত্ব দেখে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে নীল বলল— আসলে দু'দিক দিয়েই শান্তিনিকেতনে যাওয়া যায়। আপনারা শান্তিনিকেতনের ঠিক কোথায় যাবেন? নীল যদিও ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল। কিন্তু উত্তরটা দিলেন ড্রাইভারের মনিব ম্যাডাম।

—শান্তিনিকেতন গেস্ট হাউস।

— তাহলে তো আপনাদের ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। আপনারা একটা কাজ করুন, সোজা চলে যান। স্টেশন থেকে বাঁদিকটা ধরুন।

— থ্যাঙ্ক ইউ।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে এগোতে যায়। নীল দৌড়ে গাড়ির সামনের জানলার কাছে চলে আসে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তার ম্যাডামের উদ্দেশে বলে— যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করব? আসলে আমি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। এখানে একটা কাজে এসেছিলাম। সাইকেলটা আনিনি। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিছু পাচ্ছি না। খুব অসুবিধা না হলে আমাকে একটু ইউনিভার্সিটিতে নামিয়ে দেবেন? ড্রাইভার মহিলার দিকে তাকাল।

— হ্যাঁ, কোনও অসুবিধা নেই। উঠে পড়ুন।

নীল গাড়ির সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে পড়ে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। নীল গাড়িতে বসে শালপাতাটা কোলের উপরে সাবধানে রাখল। বেশি চাপ পড়লে ভিতরের পলাশ ফুলগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মহিলা পিছনের সিট থেকে নীলের হাতে পলাশফুলগুলোকে দেখল। তারপর ফুলগুলো থেকে চোখ সরিয়ে আবার জানলার বাইরে তাকাল। হঠাৎ সূর্যের আলো কেমন জানি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে মহিলা তাকালেন। দূরে কতগুলো মেঘ সূর্যটাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।

মহিলা নীলের দিকে তাকায়। নীল গাড়ির সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। হঠাৎ-ই মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন— আপনি কী পড়ছেন?

—আমি কলাভবনের ছাত্র, স্কাল্পচার নিয়ে গবেষণা করছি। মাস্টার্সও এখানে।

— তা হলে আপনার তো এখানে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল।

— তা নেই নেই করে ৫-৬ বছর তো হয়েই গেল।

একটু থেমে নীল পিছন দিকে ঘুরে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল— আপনি কি এই প্রথম শান্তিনিকেতনে?

মহিলা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

— বসন্ত উৎসব দেখতে?

আবার মহিলা ঘাড় নাড়লেন।

নীল আবার সামনের দিকে ঘুরে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেমন জানি ঘোষণা করার সুরে বলল— বসন্ত উৎসব দেখতে পাবেন কিন্তু শান্তিনিকেতন পাবেন না।

মহিলা এমন কথা শুনে কিছুটা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে এগোতে যায়। নীল দৌড়ে গাড়ির সামনের জানলার কাছে চলে আসে। ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তার ম্যাডামের উদ্দেশে বলে— যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করব?

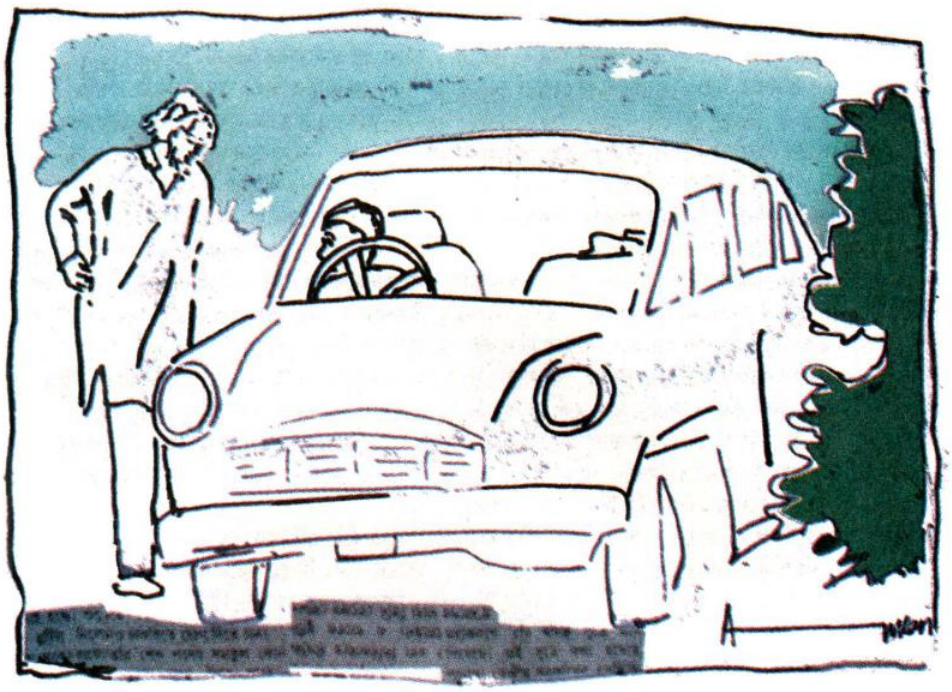

এ সব যখন ভাবছে শুভশ্রী ঠিক সেই সময়ে ঋতৃণ তার ফোনটা শুভশ্রীর দিকে এগিয়ে দিল—একটু কথা বলুন, সুনেত্রাদি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে কানে দিল শুভশ্রী।

করলেন— মানে?

—এই সময় লোকজনের ভিড়ে শান্তিনিকেতন পুরো অশান্তিনিকেতন হয়ে ওঠে।

বলে আপন মনেই নীল মুচকি হাসে।

তারপর আবার পিছনে ফিরে মহিলার দিকে তাকিয়ে নীল বলল— তবে হাতে এখনও দু-আড়াই দিন সময় আছে। লোকজনের উৎপাত কিছুটা কম থাকবে।

আবার সামনে ফিরতে গিয়ে একটু বেশি নড়াচড়া করে ফেলে নীল। ওর কোলের থেকে কয়েকটা পলাশফুল গিয়ে পড়ে ড্রাইভারের আর ওর মাঝখানে হ্যান্ডব্রেকের ওপর। আবার মহিলার চোখ যায় পলাশ ফুলগুলোর দিকে।

—পলাশ কোথায় পেলেন? কাগজে পড়েছিলাম এখন এখানে নাকি গাছ থেকে পলাশ তোলা বারণ।

— হ্যাঁ। বারণ তো বটেই। এগুলো অবশ্য কেনা। ইউনিভার্সিটি চত্বরে চট করে পাবেন না। এগুলো কেনার জন্যই তো শান্তিনিকেতনের বাইরে আসা।

ঘাড় ঘুরিয়ে সহযাত্রীর দিকে ফিরে নীল বলল, আপনার পছন্দ? চাইলে এখান থেকে কয়েকটা রাখতে পারেন।

—পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু দাম নিতে হবে।

—সে কী? এই যে আপনার গাড়িতে লিফট পেলাম, এর জন্যও দাম দিতে হবে নাকি।

—না না।

—নিন এ ফুলগুলো রেখে দিন।

একটা শালপাতায় প্রায় অর্ধেক পলাশ মহিলার দিকে এগিয়ে দিল নীল, ওয়েলকাম টু শান্তিনিকেতন।

মহিলা হেসে ফুলগুলো নিলেন। তারপর জানলা দিয়ে তাকালেন। তার চোখে পড়ল একটি দোকানের সাইনবোর্ড। বুঝলেন ওরা বোলপুরে ঢুকে গিয়েছেন। আকাশে মেঘ ক্রমশ সূর্যকে গ্রাস করছে।

রঞ্জনদার ক্যান্টিনে সবার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে ঋতৃণ ফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শুভশ্রী এবার হোস্টেলে ফিরবেই ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু হোস্টেলের মেয়েদের জন্য ও এক প্রকার আটকে পড়েছে। মনে মনে শুভশ্রী ঠিক করে ফেলেছে আর কোনও দিন এমন দায়িত্ব ও নেবে না। অন্যদের জন্য এমন বন্দি হয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয়?

এ সব যখন ভাবছে শুভশ্রী ঠিক সেই সময়ে ঋতৃণ তার ফোনটা শুভশ্রীর দিকে এগিয়ে দিল—একটু কথা বলুন, সুনেত্রাদি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। ওর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে কানে দিল শুভশ্রী। অপর প্রান্ত থেকে টেলিফোনে সুনেত্রাদি শুভশ্রীকে জানালেন তিনি সকাল থেকে টেলিভিশনে 'লাইভ' দেখছেন। কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে তিনি কতটা উত্তেজিত।

—এই লাইভে তুই দাঁড়ালি না কেন? ঋতৃণ বলল, আমি না বললে তুই দাঁড়াবি না। শুভশ্রী বাধ্য হওয়া ভাল, তাই বলে আমি কি বাবু তোকে সব বলে দেব। এবারের লাইভে দাঁড়াস কিন্তু। ঋতৃণ তো বলল তুই ছাড়া লাইভ কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে হয়ে যায়। ওর তোকে খুব পছন্দ। ছেলেটাও ভালো। পরের লাইভে তোকে

যেন দেখি।

একনাগাড়ে সুনেত্রাদি কথাগুলো বলে গেল। 'কলকাকলি'র হোস্টেলের ইনচার্জের কথা কী ভাবে আর অমান্য করবে শুভশ্রী! ঋতৃণ ফোনটা নিয়ে সুনেত্রাদিকে জোরে জোরে বলল—

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আর দুটো লাইভের পর ওদের ছেড়ে দেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ। শুভশ্রী থাকলে তো কোন চিন্তাও নেই। ও লাইভটা এত ভালো বোঝে। যতই হোক জার্নালিজমের ছাত্রী তো...

শুভশ্রীর কেন জানি মনে হল ঋতৃণ ওকে শোনানোর জন্যই জোরে জোরে ফোনে কথা বলছে। ব্যাপারটা এতটাই অসহ্য লাগল যে শুভশ্রী উঠে রঞ্জনদার ক্যান্টিনের বাইরে চলে এল। শান্তিদেব ঘোষের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি হবে নাকি? হঠাৎ শুভশ্রীর মনে হল, হোক বৃষ্টি। তাতে যদি ঋতৃণের 'লাইভ ভেস্তে যায় তবে বাঁচা যাবে।

দেখতে দেখতে ন'টা বাজতে চলল। গণদেবতা এক্সপ্রেস বোলপুরে পৌঁছে গিয়েছে। লিনা দীর্ঘদিন বাদে বোলপুর স্টেশনে নামলেন। মনে করতে চেষ্টা করছেন তার চেনা বোলপুর স্টেশনটার কতটা এখনও বর্তমান। আস্তে আস্তে তিনি এগোতে লাগলেন।

পিঠে হ্যাভারস্যাক, এক হাতে ব্যাগ, অন্য হাতে মোবাইল আর মুখে চুলের একটা ঢাউস ক্লিপ দাঁতে চেপে দ্রুত স্টেশন থেকে বেরোল তৃণা। খোলা দীর্ঘ চুলের মেয়েটা এমন হনহনিয়ে হাঁটছে যেন বেরিয়েই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাস তার জন্য অপেক্ষা করছে। স্ট্যান্ডের সব থেকে সুন্দর পলাশে সাজানো রিকশাতে সে চেপে বসল। দাঁত থেকে ক্লিপ নামিয়ে বলল, শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজ যাব।

এদিকে গাড়ির ভিতর অনর্গল বকে চলেছে নীল।

—তা ম্যাডাম হঠাৎ এ'বছর শান্তিনিকেতনে কেন?

—আমার নাম ম্যাডাম নয়। অভিষিক্তা চ্যাটার্জি।

—ওহ্। আমার নামটাই তো আপনাকে জানানো হয়নি।

নীল গাঙ্গুলি। সবাই আমাকে নীল বলেই ডাকে। বলে নীল পিছনে ফিরে হাত বাড়াতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিপজ্জনকভাবে ওদের গাড়ির সামনাসামনি এসে পড়ল তৃণার রিকশা। আসলে চালক বেশ জোরেই চালাচ্ছিল রিকশাটা। বাঁক ঘোরাতে গিয়ে একেবারে গাড়ির মুখে। ভাগ্যিস অভিষিক্তার অভিজ্ঞ ড্রাইভার ঠিক সময় ব্রেক কষেছিল। অভিষিক্তা, নীল দুজনেই সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

সামলে নিয়ে অভিষিক্তা বলল, একটু দেখে চালান।

—সরি ম্যাডাম। আমার দোষ না, রিকশাটা এমনভাবে এসে পড়ল।

গেট খুলে ড্রাইভার দেখতে নামল তার গাড়ির কোন ক্ষতি হয়েছে নাকি। নীলও নেমে পড়ল।

রিকশাতে বসে তৃণা রীতিমতো ঝাঁঝালো কণ্ঠে তখন চালককে বকতে ব্যস্ত—হর্নটা রয়েছে কীসের জন্য। হর্নটা তো বাজাবে।

নীল আর ড্রাইভার গাড়িতে ফিরে এল। তৃণার রিকশা আবার চলতে শুরু করল। তৃণা রিকশাওলাকে সাফ জানিয়ে দিল।

ঠান্ডা মৃদু মন্দ হাওয়া বইছে। বার্তা দিচ্ছে দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। একটা বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে ফিরে এখন মনটা কিছুটা শান্ত হয়েছে তৃণার। জীবনের বড় কিছু ঘটনা কত সহজেই আমাদের ছোট ছোট কত ঘটনা ভুলিয়ে দেয়।

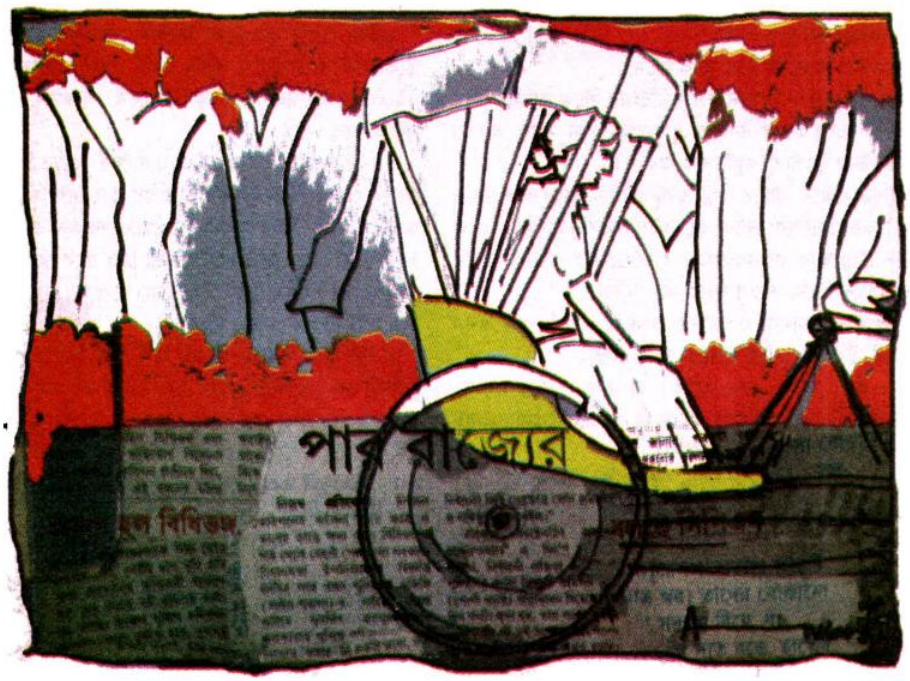

আমার কিন্তু কোনও তাড়া নেই। আপনি আস্তে চালান।

মাথা নাড়লেন রিকশা চালক। আসলে এই সময় যত তাড়াতাড়ি ভাড়া খাটা যায় ততই ভালো।

বসন্ত উৎসব, পৌষ মেলা...বছরের তো এই কয়েকটা দিন ওদের। তাছাড়া বৃষ্টিও নামতে পারে। রিকশা চালক তৃণার বারণ সত্ত্বেও প্যাডেলে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল। অভিষিক্তার গাড়ি বিশ্বভারতীর চত্বরে ঢুকে গিয়েছে। সুবর্ণরেখা পেরোতেই নীল বলল, দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি এখানেই নেমে যাব। ড্রাইভার রাস্তার বাঁ পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিলেন।

—আপনি এখানেই থাকেন বুঝি?

—না। সুবর্ণরেখা থেকে একটা গানের সিডি কিনব। আমি থাকি কালো বাড়িতে। (একটু গর্বিত ভাবে বলল সে) এখানকার সবাই চেনে বিখ্যাত কালো বাড়ি।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে নীল বলল আপনারা সোজা চলে যাবেন। দুটো মোড় ক্রস করে ডান হাতে। কাউকে জিজ্ঞেস করে নেবেন।

গাড়ি থেকে নেমে নীল দরজা বন্ধ করে পিছনে বসা অভিষিক্তার জানলার পাশে দাঁড়াল।

—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে লিফট দেওয়ার জন্য।

—দাম তো দিয়ে দিলেন। হেসে সিটের ওপর পড়ে থাকা পলাশফুলগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখাল অভিষিক্তা।

—শান্তিনিকেতন ঘুরতে চাইলে খবর দেবেন। আমি কিন্তু খুব ভালো গাইড। অভিষিক্তা মুচকি হেসে বলল, তাই! তা কী করে খবর দেব?

—ওহো। সেভ করে নিন আমার মোবাইল নম্বরটা। অভিষিক্তা তার আইফোনটা বার করল।

—৯৪৩০১... নম্বরটা নিয়ে নীলকে বিদায় জানাল অভিষিক্তা। গাল ভর্তি অমার্জিত খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নাকটা টিকালো, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করা নীলের সঙ্গে পরিচয়টা মন্দ লাগল না তাঁর। পুরো ব্যাপারটাই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মেলে ভালো। অভিষিক্তা তো ঠিকই করেছে এই কয়েকদিন সে গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকবে। আর থাকবেন রবীন্দ্রনাথ আর শান্তিনিকেতন।

আরেকটা গাড়ি এখন শান্তিনিকেতনের পথে। গাড়িটা চালাচ্ছে অনর্ঘ্য, পাশে বসে দেবযানী। দেবযানী কথা বলেই চলেছে। কত কথা স্ত্রীদের। রোজকার ব্যস্ত জীবনে স্বামীদের আর কতটুকুই বা পায় তারা। দেবযানী বলেই চলেছে। স্টিয়ারিং হাতে অনর্ঘ্য কিন্তু যথেষ্ট সাবধানি আর সজাগ। দেবযানীর কথায় মাঝে মধ্যে হুঁ-হা করছে বটে, কিন্তু তার মাথায় এখন কত চিন্তা যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

দেবযানীই বলল—অনেকক্ষণ একটানা গাড়ি চালাচ্ছ। কোথাও একটু চা খেয়ে নাও না।

অনর্ঘ্য ভাবল সত্যি তো, চা সহযোগে একটা সিগারেট হলে মন্দ হয় না। ওরা ঠিক করল, এবার ধাবা দেখলেই ওরা দাঁড়াবে। বর্ধমান রোডে আবার ধাবার অভাব। কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল একটা সাদামাটা ধাবা। দেবযানী তা দেখেই কী খুশি। আসলে তার কাছে খাওয়াটা গৌণ। হাইওয়ে, ধাবা, ব্যাপারটাই ওর দারুণ লাগে। এদিক দিয়ে অনর্ঘ্যকে ভাগ্যবান বলতে হয়। দেবযানী কত ছোট ছোট ব্যাপারেই খুশি হয়।

ঠান্ডা মৃদু মন্দ হাওয়া বইছে। বার্তা দিচ্ছে দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। একটা বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে ফিরে এখন মনটা কিছুটা শান্ত হয়েছে তৃণার। জীবনের বড় কিছু ঘটনা কত সহজেই আমাদের ছোট ছোট কত ঘটনা ভুলিয়ে দেয়। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা-সাহিত্যে জেদি মেয়েটা কত সহজে, সব অভিমান ঝেড়ে ফেলে, অনর্ঘ্যর মোবাইল নম্বরে ফোন করে ফেলল। রিকশাতে যেতে যেতেই।

অনর্ঘ্য আর দেবাযানী ততক্ষণে অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। অনর্ঘ্যর চাই লিকার চা। না দুধ, না চিনি। দেবযানী একটা কোল্ডড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছে। অনর্ঘ্য স্ত্রীকে বোঝাতে ব্যস্ত যে কোল্ডড্রিঙ্কস খাওয়া শরীরের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক...মাঝে মাঝে স্ত্রীকে জ্ঞান দিতে কোন বিবাহিত পুরুষেরই না ভালো লাগে!

ঠিক সেই সময় অনর্ঘ্য সেনের ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রিনে ভাসছে তৃণার নাম। চা অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর সামনে থেকে ফোন নিয়ে ঝট করে বেরিয়ে যাওয়াও যায় না। একটু ইতস্তত করে ফোনটা ধরল সে।

—হ্যালো। (অনর্ঘ্যর কানে ভেসে এল ব্যস্ত রাস্তা, রিকশার হর্ন) বলো।

—আমি পৌঁছে গিয়েছি। তুমি কোথায়?

—এই তো শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। বসন্ত উৎসব দেখতে। এখনও পৌঁছোতে ঘন্টা দেড়েক লাগবে। তোমার খবর কী?

—এখনও ঘন্টা দেড়েক। বোর হয়ে যাব তো?

—তারপর? সব খবর ঠিকঠাক?

—(তৃণা একটু হেসে) হে হে। বউদি কি তোমার দিকে তাকিয়ে আছে? একটু সরে এসো না।

অনর্ঘ্য জানে এখন উঠে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। দেবযানীর যাতে কোনও সন্দেহ না হয় সেই জন্য অনর্ঘ্য কথা মোড় ঘুরিয়ে দিল।

—সেই তো। ক্লাসের এখন যা চাপ বেড়েছে। দুম করে বেরিয়ে পড়াই মুশকিল।

তৃণা রিকশাতে বসেই অধৈর্য হয়ে পড়ল।

—ধুস! তাড়াতাড়ি এসো। মিস ইউ। তুমি এলেই বেরোব। ফোনটা কেটে দিল অনর্ঘ্য। দেবযানী জিজ্ঞেস করল। কে গো?

—ওই ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক। আমাদের সবার ক্লাস এত বাড়িয়ে দিয়েছে না...ও সবই বলছিল। নির্দ্বিধায় স্ত্রীকে মিথ্যে কথাগুলো বলল অনর্ঘ্য।

লিনা স্টেশনের বাইরে এসে যেন একটা বড় ধাক্কা খেলেন। আধুনিক ঘিঞ্জি বোলপুরের চেহারা দেখে চিনে উঠতেই পারছেন না তার আজন্ম দেখা সেই বোলপুরকে। আনমনে কিছুটা হেঁটেও ফেললেন। হঠাৎ-ই লিনার মনে হল আকাশের পরিস্থিতি সুবিধার নয়। বৃষ্টি আসতে পারে। বসন্তে বৃষ্টি! ❖

চলবে

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসি পিসি

প্রবালকুমার বসু

কোনও কিছু বিবর্ণ দেখলে আমার হাসি পিসির কথা মনে পড়ে
ছোটো করে কাটা চুল, বয়েজ কাট, ভারী কোমর
হাসি পিসি দোক্তা খেতে ভালোবাসত খুব
শুধু ঠাকুরঘর আর হেঁসেল, হেঁসেল আর ব্যালকনি
এর বাইরে যেন অন্য কোনও কিছুর অস্তিত্বই নেই
কিছুটা পুরোনো আসবাব আর পরম আত্মীয়ের মাঝামাঝি
হাসি পিসি আমাদের সংসারে মায়ের পাশাপাশি
তবুও মায়ের মতন ঠিক নয়, অন্যান্য পিসিদের মতনও নয়
এক নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুজ্জ্বল কি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অভিযোগহীন
হাসি মুখে কেমন যেন রয়ে গিয়েছিল অতি প্রিয় পুরোনো চিঠির মতন

অথচ বাবার কেমন বোন, এই কথা ঠিক করে মা-ও কখনও
বোঝাতে পারেনি

শর্মিলা চানুর বাহিনী

পলাশ দে

এক
তোমার নাকের নল দিয়ে তৈরি নদীটার নাম,
নানালিম— আমি জানি
নীরব এগারো বছর মাটির দিকে
তুমি আকাশ ফেরাচ্ছ— আমি জানি

আমি তো কিছুই পারছি না চানু
তোমার সমস্ত মেইতেই ভাষা বাংলা হয়ে যাচ্ছে

আমার লোকাল পাখি, হাওয়া, ভাঙা রাস্তা
জড়ো করি, করে, এসব গেরিলা পাঠাচ্ছি তোমাকে

দুই
ধরে রাখি, জাপটে সব 'ছি:' 'ছো:'
তোমার নিশ্বাস থেকে বেঁকে যাওয়া পথ
তাঁবু টাঙায়, ট্যুরিস্ট আসে, বাতাস বদল
কোথাও একটা 'শর্মিলা চানুর লেন' হয়ে যাচ্ছে—

দেশ পালানো মানুষ... স্বজন ডিঙানো
ঘর ছিটকে বেরিয়ে আসা মায়া মোহাব্বত

এদিকের এই আমার এমনি খালি গলা
তুমি, সেনাদলে, যা হোক কোরাস ভেবে নিও

সুন্দরবন

সুকান্ত মণ্ডল

ভেঙেছে ঘরবাড়ি মাটির প্রকৃত নাম
ধূলিকণা জলজ সন্ধ্যার চাঁদ
অল্প আয়ুর ভেতর ঠোকরায়
কাঁচপোকা
কাঁটাঝাঁজি...

টংতুলে রাখে অচৈতন্য প্রহর
আর গ্রাম্য বাঁশির প্রতিটি ছিদ্রপথ
নদী...

ধানশীষ, ক্লোরোফিল
ক্ষয় স্রোত সুন্দর বন।

নেতিবাচক

শ্রীদর্শিনী চক্রবর্তী

শব্দ, আমি কেমন তোমায় ঠোঁটের মাঝে
মাঝবিকেল একলা পেলেই কামড়ে ধরি,
একটু হলেও পরপুরুষের মতন ঋজু
চেক কলারে নীলচে ব্যথা ন্যস্ত করি।

উল্টোপাল্টা হাওয়ার দোষে নিন্দ উড়ে যায়,
জানলা পেয়ে উড়বে ভাবে সোনার তরী,
অট্টালিকা মানায় না এই সঙ্গোপনে
বিদ্যে থেকে লোপ পেয়ে যায় বিদ্যেধরী।

বোঝার থেকে না- বোঝারা বৃহত্তর,
'না'-এর কত ক্ষমতা আর বাছবিচারী,
আঙুল থেকে আঙুলে যায় আমার সোহাগ,
ঘুমের থেকে ঘুমের দিকে তোমার ঘড়ি—

কবিতার নাম কবিতা

শুভ্রনীল সাগর

তুই হাজার বার বললেও, মাঘের নিশুতি অর্থ সেই একই থাকবে। শীতের মস্তাজ বলে যা তুই পড়াতে চাইলি, তাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এল নদী! নদী শুকিয়ে গেলে আমাদের বড় কষ্ট—দিনকে দিন কমে যায় হৃদয়ের নাব্যতা। পলির গুরুত্ব তুই জানিস। তুই এও জানিস, সাব-অল্টার্নে আমার কী ভূমিকা। বরং তোর পুরোনো কোষেরা মরে এলে, খানিকটা পলি মেখে নিস। কেউ আঁচড় কাটলে, ফুটে উঠবে গাত্রচিহ্ন...

রাস্তাপার আমি একলাই হতে পারি। শুধু মাঝপথে কেউ ছেড়ে গেলে, পথে দূরত্ব আমার
অবাধ্য হয়ে ওঠে...

নভেলেট

চিহ্ন

স্বাতী গুহ

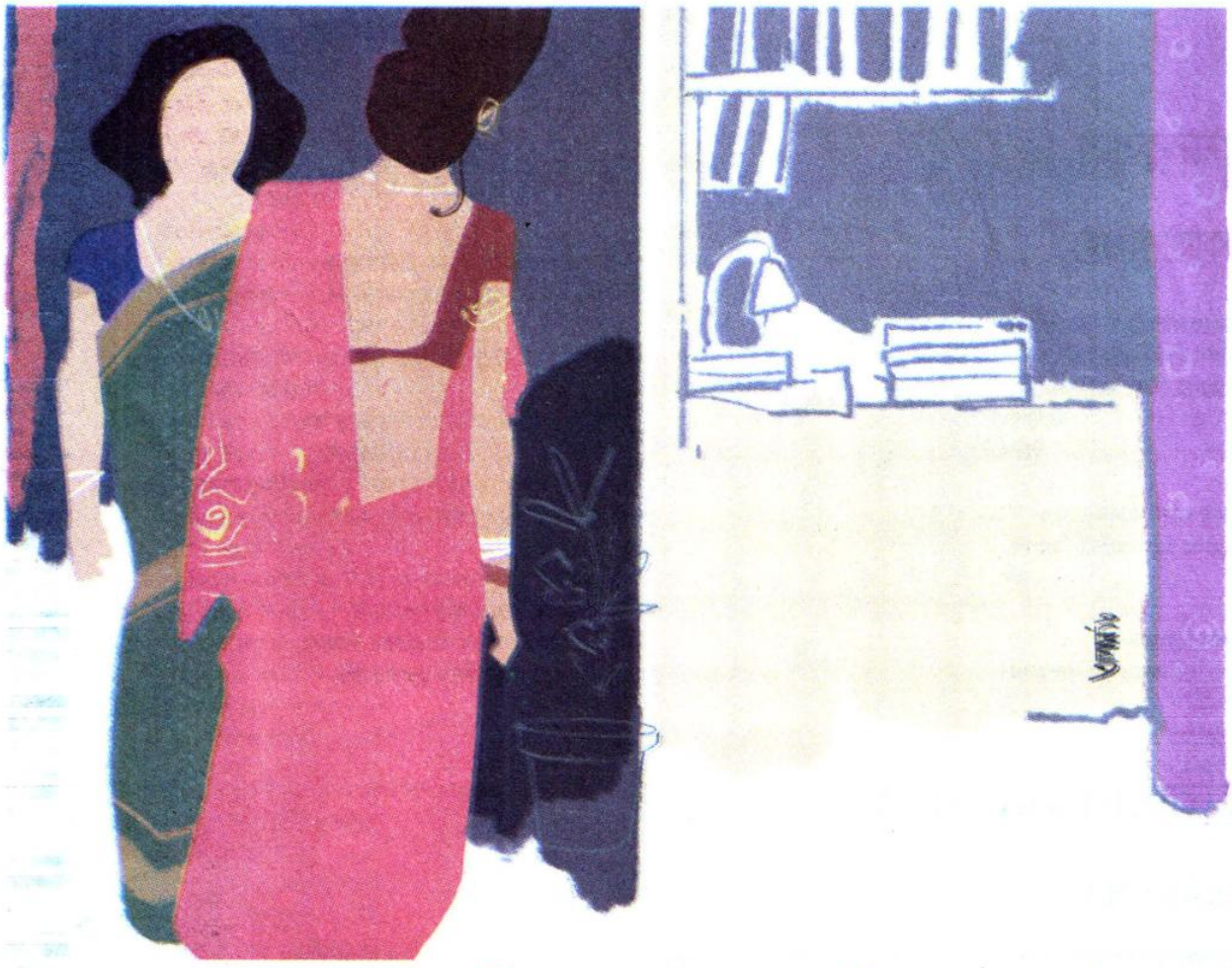

তুলু বিয়ের পর এই প্রথমবার ফিরে এসেছে সল্টলেকের বাড়িতে। অষ্টমঙ্গলায় আসা হয়নি। সোহমের শরীরটা নাকি হঠাৎ এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে ডাক্তার টানা সাতদিন বেড রেস্ট সাজেস্ট করেছিলেন।

কিন্তু তারপরের সপ্তাহটাও নানা কাজে আটকে থেকে অবশেষে আজ প্রায় উনিশদিন পর এ বাড়িতে তুলু। মা, মাসি, বম্মা, ছোটমণি সবাই এসে হাজির। কিন্তু তুলু কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। গাড়ি থেকে নামতেই দাদা সোহমকে বলে ফেলেছে—

'আমার একটাই বোন। যত্ন করে রেখেছিলাম চব্বিশ বছর। তুমি তো দেখছি এই ক'দিনেই আমার বোনটাকে....'

পরমা দক্ষতার সঙ্গে স্বামীকে থমিয়ে একেবারে মাঝপথে ঢুকে পড়েছে নবদম্পতির—

'বাঃ! এই বেনারসিটা তো তত্ত্বে ছিল না। এটা আবার কে দিল?'

'এটা ওর দিদা বেনারস থেকে পাঠিয়েছে'—তুলুও যেন এই দুঃশাসন সময়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় হালকা গোলাপি রঙের ওপর রূপোলি সুতোর কাজ করা ঠাস বুনোটের এই বিশেষ শাড়িটির আড়ালে। ওর এক ঢাল স্টেপ কাট চুলের আড়াল থেকে উঁকি দেয় পিঠের বিস্তৃত মসৃণ জমিন। ঘাড়ের দুদিক থেকে দুটি স্ট্রিং টানটান করে এনে সুন্দর একটা নট বাঁধা। কোমরের ঠিক ওপরে ব্লাউজের তিন আঙুল চওড়া স্ট্র্যাপ। ওপরের নট থেকে ঝুলন্ত সুতোর দু'মুখে ডিজাইনার নট ঝিলমিল করছে। কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত মেহেন্দির আলপনা কিছুটা ফেডেড। কিন্তু নকশার কারিকুরি দূর থেকে দেখলেও স্পষ্ট। এখনও মেটে শাঁখায় লাল সুতোর গিঁটের বাকি অংশ জড়িয়ে গেছে সোনালি ঝুরো চুরির গায়ে। সকালের মিহি রোদে তুলুর গায়ের রঙের সঙ্গে মিশেই যেন ঠিকরে উঠছে কঙ্কনের মিনেকারির কাজ। গেট থেকে বাইরের ঘর পর্যন্ত পৌঁছোতে যে এত সময় লাগতে পারে তা যেন ও চব্বিশ বছরে এই প্রথম টের পেল। ডান হাত দিয়ে কুঁচি আর বাঁ-হাতের পুরোটা লাগিয়েও শাড়ির বহতা ধারাকে সামলানো সহজ হচ্ছিল না তুলুর পক্ষে। কেমন ভারী লাগছিল সবকিছু। শরীর, শাড়ি, গয়না, হাঁক-ডাক, উলু, শাঁখ, আসন, ঘট, দেওয়াল এমন কী মাথার ওপর নেমে আসা ফ্যানের হাওয়াটাও।

'কীরে শাশুড়ি খেতে দেয়নি নাকি তোকে ঠিকমতো? এই ক'দিনে কী ছিরি হয়েছে তোর!'—ছোটমণির মুখে এত বয়সেও কোন রাশ নেই। যা মনে আসে, বলে ফেলতে অনায়াস এখনও বাবার এই একমাত্র জীবিত বোনটি।

'কেন, আমিও তো আপনাদের বাড়িতে এসে প্রথমে বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে গেছি। আর বিয়ের পরই মুটিয়ে হাতি হয়ে যাওয়ার থেকে একটু রোগা থাকাই ভালো'—এবারও বৌদির পরমা সুন্দরী রূপ আর উপস্থিতির চটক থামিয়ে দেয় সবাইকে। কিন্তু তুলু ফেব্রুয়ারির হিমেল হাওয়াতেও ঘেমে উঠতে থাকে ভিতরে ভিতরে। সোহমের দিকে ফিরে থাকতে ইচ্ছে করে না ওর। পরমা কানের কাছে মুখ রেখে বলে ফেলে — 'ক'বার দিনে?' মাথাটা চিড়বিড় করে ওঠে ওর। মা বরণডালার সরা সহ প্রদীপটির শিখা স্পর্শ করাবে বলে নবদম্পতির খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। সোহমের হাসি মুখের আড়ালে থাকা মানুষটার কথা মনে পড়তেই কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে তুলুর। ওয়াক করে কিছুটা সাদা জল বেরিয়ে আসে ওর গলার শুকনো নলির ড্রেনপাইপ দিয়ে। মায়ের শাড়ির কুঁচি আঁকড়ে ধরে মুহূর্তেও। দাদা অস্থির হয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে চাইলে সমস্ত বাড়িটা কেমন অবাক চোখে চুপ করে থাকে কয়েক সেকেন্ড। বম্মা বলে ফেলে, 'কিছু হলেও তো এর মধ্যে ধরা পড়ার কথা না।'

তুলুর শরীরটাকে প্রায় পেঁচিয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে চলে যায় পরমা। তুলুও জানে ওর শেষ আশ্রয় এটা।

কী হয়েছে বল তো?

কিছু না। কেমন যেন বমি পেল।

এর মধ্যেই কনসিভ করলি নাকি?

কী যে বলো!

কেন? তোর ডিউ ডেট কবে?

ধ্যাত! কী বলছ!

কেন? তুই কি এখনও সেই তোর দাদার বারো বছরের ছোট কচি খুকি বোনটা।

বাজে কথা বোলো না তো।

তুই বাজে কাজ করতে পারবি। আমি বললেই খারাপ!

কোনও বাজে কাজ করিনি আমি।

তুলু, তুইও শিখে গেলি বল, বরের সঙ্গে যা খুশি করা যায়!

না, আমি কিছুই শিখিনি।

কী যা তা বলছিস!

যা সত্যি, তাই বলছি।

দরজায় মায়ের ডাক স্পষ্ট হতেই পরমা এক ঝটকায় ঘরের বাইরে চলে যায়। নতুন জামাইকে কমফর্টেবল রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা সে আগেই ছকে রেখেছিল। এখন একটা একটা করে এক্সিকিউট করার পালা। সোহম আর ওর এক দুঃসম্পর্কের মামাতো ভাই ঋতম ততক্ষণে ড্রয়িংরুমের আনুষ্ঠানিক কাজ সেরে ডাইনিং টেবিলে। ব্রেকফাস্টের থালার সাদা ধবধবে লুচির মতোই ততক্ষণে পরমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে—সামথিং গড়বড়! তবে সেটা কী, তা যত তাড়াতাড়ি জানতে পারবে তত তাড়াতাড়ি কমব্যাটিং মেকানিজম ফাইন্ড আউট করতে পারবে ও। নিজের ওপর এই অগাধ বিশ্বাস তার আছে। আজ থেকে বারো বছর আগে এই বাড়িতে বউ হয়ে এসে কিশোরী তুলুর যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা সামলেছে ও প্রায় একার হাতে। তুলুর চার বছর বয়সে হঠাৎই স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে শাশুড়ি যে আর কিছুই ঠিকমতো করে উঠতে পারেন না, তা বিয়ের আগে থেকে সুনন্দর কাছে পইপই করে শুনে এসেছিল পরমা। শুধু সুনন্দ নয়, ওর মা আর বোনের সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি থাকাটাই ছিল ওদের বিয়ে করার প্রাথমিক শর্ত। মাল্টিন্যাশনালের দামি চাকরির কল্যাণে স্বচ্ছতায় টান পড়েনি কোনও দিন। তাই পরমা সংসারের মুটেগিরির বাইরে থেকে এ বাড়ির তিনটি মানুষকে আয়ত্তে রাখতে পেরেছিল সহজেই। সুনন্দ তাই আড়ালে তাকে পরমা নয়, পারঙ্গমা বলে ডাকতে শুরু করেছিল কিছুদিন পর থেকে। এই ছোট ননদটির স্কুল, কলেজ, হবিজ, অ্যাডোলোসেন্ট পিরিয়ডের সমস্ত ঝক্কিই প্রায় একা সামলে দিয়েছে সে। ফ্রেন্ড-ফিলোজফার-গাইড হয়ে গেছে সে নিজের অজান্তেই।

বউদির বিছানায় আরও বেশি লেপটে যেতে যেতে তুলু ফিরে যাচ্ছিল স্কুলের সেই সব দিনগুলোয়। দাদার সঙ্গে পরমাদির প্রেমের কথা সে জানত ওদের বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। মা-মাসির বাড়িতে গেলে পরমাদি যে দুপুরবেলা এ বাড়িতে আসত তাও জানত ও। কোনও কোনও দিন বিকেলে স্কুলের গাড়ি থেকে নেমে দাদার গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে ও বুঝত পরমাদি এসেছে। পরমাদি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই জড়িয়ে ধরত ওকে। আদর করত বাচ্চাদের মতো টিপেটুপে কিন্তু শুধু দাদার গায়ের গন্ধ ছাড়া আর কিছু টের পেত না সে সব দিনে পরমাদির শাড়ির ভাঁজ, পেটের সাদা খোলা জায়গা কিংবা হাতের তালু থেকে। দাদা কিছু বলত না আলাদা করে। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে দেখতে পেত কিছু না কিছু গিফট সেদিনের জন্য রাখা থাকত তার জন্য। কিন্তু এটা যে ব্রাইব, তা বলা যাবে না। মায়ের এ সব দিকে খেয়ালই থাকত না তেমন। আর দাদা তো পনেরো বছরের বড়। সুতরাং দাদার কাজকারবারকে নম্বর দেবার মতো কোনও জায়গাই ছিল না তার। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল পরমাদি। পরির মতো সুন্দরী আর কিন্নরীদের মতো গানের গলা! তুলুর সমস্ত মুগ্ধতা আদায় করে নিয়েছিল পরমাদি প্রথমদিনেই। শুধু বিয়ের দিন সকালবেলায় তত্ত্ব নিয়ে পৌঁছানোর পর পরমাদিই বলেছিল, 'আজ থেকে আমাকে বউদি ডাকবি শুধু। মনে থাকবে?' ক্লাস সেভেনের তুলু মানে সুমেধা এমন অসামান্যা এক বৌদির সঙ্গে কাল থেকে বাড়িতে সারাক্ষণ, ভেবেই মাথা দুলিয়ে রাজি হয়ে গিয়েছিল সে। বন্ধুদেরও অ্যাক্সেস বেড়ে গিয়েছিল ওর বাড়িতে বউদি আসার পর থেকে। আর প্রতিটি কথা শেয়ার করার একজন মানুষ বাড়িতে থাকার যে

অসামান্য সুবিধে, তা খুব বেশি করে টের পেয়েছে তুলু গত আঠেরো দিনে। যেন দ্বীপান্তর হয়েছে তার এমন এক দেশে, যে দেশের কেউ তার ভাষা বোঝে না, সে তাদের। শুধু পাশে থেকে, শুধু দেখে সে যা বুঝেছে তা কীভাবে জানাবে আজ বউদিকে। কিছুতেই ভেবে পায় না। যন্ত্রণায় মাথার দু'পাশের শিরা দপদপ করে ওঠে। ইচ্ছে করে এই সব বেনারসির ভড়ং একটানে খুলে ফেলে দেয়। বাড়িশুদ্ধু লোকজনকে ডেকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সোহমের আসল সত্যটা বলে দেয়। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই যুক্তি সাজায়—'কেন সম্ভব নয়?' বিয়ে, শ্বশুরবাড়ি, ফুলশয্যা, হানিমুন—এই সব শব্দগুলো কীভাবে ফলে ওঠে তা তো সে গত বারো বছর ধরে দেখে এসেছে এই বাড়িতে। বড় অযৌক্তিক কিছু কি চেয়েছিল সে! পাত্র পছন্দ করেছে ভারত ম্যাট্রিমনির অ্যাড থেকে। চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে দাদা আর বউদি। কোথাও কোনও ফাঁক তবে কেন ওরা ধরতে পারল না আগে? তবে কি দাদার ওপর খুব রাগ হচ্ছে এখন ওর? নাকি বউদির ওপর! যে বউদিকে ও সমস্ত কিছু বলেছে, শিখেছে জীবনের পাঠ যার প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে—সে কীভাবে এমন ভুল করতে পারে! কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না তুলু।

পনেরো বছরের বড় দাদার কামকলার পারদর্শীতার গল্প এত জানতো ও যে ওর ধারণা হয়েছিল চার বছরের বড় সোহম তো না জানি আরও কত দক্ষতার পরিচয় দেবে। সোহম এরই মধ্যে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা ডেভেলপড্ কান্ট্রিতে ঘুরে এসেছে, কাজেই ওর অ্যাপ্রোচ চু দ্য সেক্সুয়াল অ্যাকটিভিটি- নিয়ে খুব বেশি ভাবেইনি তুলু বিয়ের আগে। বরং যেদিন ওরা এক সঙ্গে দুজন প্রথম বাইরে দেখা করেছিল বিয়ের আগে, সেদিন সোহমের আচরণে বেশ ইমপ্রেসড্ হয়েছিল সে। কোনও আদেখলেপনা নেই। তাড়াহুড়ো নেই, কুল, কম্পোজড্ মনে হয়েছিল সে। কোনও আদেখলেপনা নেই। তাড়াহুড়ো নেই, কুল কম্পোজড্ মনে হয়েছিল তার ভাবী স্বামীটিকে। কি রে ওলনি কিসিং অর স্মুচিং?

যাঃ ! বলায় শুনতে হয়েছিল-

ওহ ! হাগিং টু?

ধ্যাত্ ! টাচই করেনি।

কান্ট বিলিভ!

সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি। আর তোমাকে মিথ্যে বলে কী হবে।

না, না তোর পিছনে লাগছিলাম। সবাই কি আর তোর দাদার মতো!

মানে?

আফটার লং টুয়েলভ্ ইয়ারস্- এটাই তোমার কনক্লুসন?

কেন আমরা চারজন এতগুলো বছর যে এত সুন্দরভাবে এক সঙ্গে আছি, এটা দেখে তোর মনে হয় যে ওটা আমার একমাত্র কনক্লুসন! কিন্তু, আই অ্যাম সিওর ইফ্ আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যা হাসব্যান্ড লাইক্ সুনন্দ, আই মে নট্ অ্যাটেইন অল দিইজ্!

তুমি আমাদের খুব ভালোবাসো, তাই না বৌদি?

শুধু ভালোবাসাবাসির কথা নয়। সংসারে এক সঙ্গে থাকার জন্য ফিনান্সিয়াল সিকিওরিটির মতো সেক্সুয়াল সিকিওরিটি থাকাও খুব জরুরি।

আমার ওই সোহম পারবে তো গো সব কিছু?

এমন করে বলছিস যেন তোর বরের সঙ্গে আমাকেই প্রথম শুয়ে সার্টিফিকেট দিলে তবে তুই বিয়ের পিঁড়িতে বসবি!

চোখের কোনও জ্বালা ধরা অনুভূতিটা ফিরে আসতে আসতে তুলুর মনে হয়, তাই তেন করলে না কৌদি! তবে তা আমাকে এভাবে কষ্ট পেতে হত না। এখন কী হবে! আমাকে কি সারাজীবন সোহমের সাজানো বউ হয়ে থেকে যেতে হবে? গত সতেরো দিনের তার অভিজ্ঞতা যেন আজ এই বাড়ির এই পরিচিত ঘরে অদ্ভুত জ্বালা ধরানো একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল তার জন্য। মনে হচ্ছিল এখুনি

তুলুর চোখের জলে ভিজে যেতে থাকে পরমার ব্লাউজ- ব্রা আর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে নরম নিপল্। খাটের ওপর থেকে মেঝে পর্যন্ত লুটিয়ে থাকা শাড়ির গোলারি রঙে ঘরের নরম আলো ভেঙে পড়ে যেন এ সময়।

শুধু চিড়বিড় করে ওঠে ওর সমস্ত শরীর। আঁচল সরিয়ে কাঁচুলি স্টাইলের ব্লাউজের বাঁধনে চুপটি করে বসে থাকা ওর সোনালি রঙের বুকদুটোকে বেডকভারের অমসৃণতায় পিষে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম তো বুঝতেই পারত না দাদার গলায়, ঘাড়ে কী এত দাগ! ফরসা ত্বকে এমন লালচে দেখাত খাবার টেবিলের তেরছা আলোয় যে তুলু অনেকবার বলেছে- 'তুমি নিশ্চয়-ই অফিসে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে চিংড়ি মাছ খেয়েছো?' সুনন্দ হাসি হাসি মুখে সায় দিয়েছে শুধু। কিন্তু আস্তে আস্তে নিজে নিজে সে বুঝে গেছে বৌদির হাতে, পিঠে, নাভির কাছে, গলায়- সমস্ত দাগই আসলে ওদের বিয়েটা কতটা সাকসেসফুল তার নজির। আর একটু বড় হয়ে এসব বিষয় নিয়ে বৌদির সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে- আরও বিস্তৃত সব কাহিনি। ইলেভেন থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েশন-এই সময়টা তো পরমা তুলুর সঙ্গে বলত না এমন কোনও কথা নেই।

মানে, ঠোঁটে চুমু খাওয়ার আগে বুকে চুমু খেয়েছিল, এই আর কী! সানান্য ব্যাপার! কী বল?

এই বানিয়ে বানিয়ে আমার দাদার নামে বলবে না বলে দিচ্ছি।

বানিয়ে বলবো কেন? আমার তো তোর দাদাকে খুব পছন্দ হয়েছিল সেদিনই

আর এখনও যা পারে! উইফ্!

তাহলে বোধহয় আমারটি একেবারে ক্যাবলাকান্ত!

অ্যামেরিকায় ক'বছর যেন ছিল?

চার বছর।

তুই ভাবছিস্ কন্ডোমের কোনও ইউজই ও করেনি এখনও?

আমি এসব কিছু ভাবছি না। আর বিয়েটা তোমরা ঠিক করেছো। কাজেই সব ভাবনা তোমাদের। আমি বিয়ে করবো আর...

আর লেগ অ্যাপার্ট করবি।

তাছাড়া বেয়ির আর কোনও ইউটিলিটি নেই?

বাথরুমে ঢুকে সাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। কিংবা বাথটাবে ডুবিয়ে রাখে তার তৃষ্ণার্ত তপ্ত শরীরটাকে। কিন্তু জল কি শান্তি দেবে তাকে? কিছুই যেন ঠিক করতে পারে না ও। পরমা এসে ওর কপালে হাত রাখতেই হু হু করে কেঁদে ওঠে তুলু সমস্ত কিছু ভুলে। মাধ্যমিকের রেজাল্টের পর যেভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল সে তুলুকে কিছু নম্বর কম পাওয়ার দুঃখের আঁচড় থেকে ওকে বাঁচাবার জন্য সেভাবেই আজ যেন আবার জোরে চেপে ধরে তুলুর ফরসা, পান পাতার মতো মুখমন্ডল নিজের বুকের নরম বালিশে। একটাও কথা বলে না ওরা কেউ। তুলুর চোখের জলে ভিজে যেতে থাকে পরমার ব্লাউজ- ব্রা আর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে নরম নিপল্। খাটের ওপর থেকে মেঝে পর্যন্ত লুটিয়ে থাকা শাড়ির গোলারি রঙে ঘরের নরম আলো ভেঙে পড়ে যেন এ সময়। বড় মায়া হয় পরমার তুলুর জন্য। ননদ হিসেবে নয়, ছোটো থেকে বড় করে তোলা মেয়েটির দায়িত্বের কথা ভেবে নয়, শুধু একটা মেয়ের কষ্ট যেন

আছড়ে পিছড়ে পড়ে ওর সামনে। যেন লুটিয়ে থাকা শাড়িটা আসলে থেকে থাকা একটা ঢেউ, যেন যন্ত্রণায় অচল হয়ে গেছে ওর সমস্ত চঞ্চলতা। তাই আর সমুদ্রের কাছে ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। যেন পাহাড়ের মতো দেয়াল হয়ে গেছে আজ পরমা। যেন বিচের শরীর ছেড়ে তাই মূর্তিমতী ঢেউ আজ জড়িয়ে ধরেছে তাকে। কীভাবে বাঁচাবে ও এই জলভারানত মেঘের সমস্ত ঝরে পনার আগ্রহকে। কিছু না বুঝতে পেরে বড় বিহ্বল লাগে ওর।

'শোন্, ভালো করে স্নান করে নে। তারপর তোর সঙ্গে বসবো।' – পরমার আশ্বাসে সামান্য মুখ তুলে তাকাবার বিনম্রতা আসে যেন তুলুর চোখে। শাড়িটার বাকি অংশ একটানে খুলে ফেলে এ ঘরের বাথরুমে ঢুকে যায় ও।

সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর দাঁড়াতেই সোহমের সঙ্গে চোখ চোখ হয়ে যায় পরমার। সেই চোখে কোনও অবাধ্যতা কিংবা অপারগতা কিছুই খুঁজে পায় না তুলুর বৌদি। বরং ভিসা, কাস্টমস্, ব্যাগেজের ওয়েট নিয়ে কথা পেকে উঠতে থাকে সোহম ঋতম্ আর সুনন্দর পারস্পরিক শব্দ বিনিময়ে। হাওয়ার গতি বুঝতেই যেন কথার তুফান ছোটাতে চায় পরমা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা ভয় পেয়ে বসে ওকে। তুলু এমন কষ্ট পাচ্ছে কেন, এরা যতক্ষণ না জেনে নিতে পারছে ততক্ষণ যেন স্বস্তি নেই ওর। শাশুড়ি-জেঠিশাশুড়ি-পিসিশাশুড়িরা নিজেদের মতো গল্পে মত্ত। রান্না খাওয়া আপ্যায়ণ পুরোটাই পরমার দায়িত্ব। আর সবাই জানে গত বারো বছর দরে যেমন সব ঠিকঠাক হয়ে চলেছে তেমনই তুলুর ফিরেযাত্রা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে। এবাড়ির অতিথিরাও যেন জানে পরমা যখন আছে তখন কারো কিছু ভাবার দরকারই নেই। সে সব তো প্ল্যান মাফিক চলবে। কিন্তু প্ল্যানের বাইরের ব্যাপারটা কি এখনই সুনন্দর সঙ্গে শেয়ার করবে নাকি একটু সময় নেবে ভাবতে ভাবতে আর এক রাউন্ড কফি বানিয়ে সার্ভ করতে আসে পরমা। ঋতমকে নিয়ে একটা খটকা মনের মধ্যে পাকিয়ে ওঠে। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় ও নিজে যখন ধুলোপায়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল তখন তো তুলু ওদের সঙ্গেই গিয়েছিল। ছিলও ওদের সঙ্গে আড়াই দিন। কিন্তু তুলুতো বারো বছরের কিশোরী ছিল তখন। আর ঋতম তো সোহমের থেকে অল্প একটু ছোটো। এত বড় পিসতুতো দাদার ল্যাজে ল্যাজে আজকালকার ছেলে কীভাবে ঘুরতে রাজি হল কে জানে। হয়ত সোহোমই জোর করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওকে। এ বাড়িতে শালী-টালী তেমন না থাকলেও তুলু নিজের লোকজনের সঙ্গে যখন ব্যস্ত থাকবে তখন ওরও নিজের একজন থাকলে তেমন অসুবিধে হবে না।

সুনন্দ পরমাকে ডেকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে দোতলার কোন ঘরে কার থাকার অ্যারেঞ্জমেন্টটা কী রকম। পরমা কফির কাপ ট্রে-তে তুলে দেওয়ার সময় আচমকা কিছুটা কাছে এসে পড়ে যেন সোহমের। সমস্ত শরীর থেকে পুরুষালি ডিও আর আফটার সেভের গন্ধ উপচে পড়ে এসে লাগে পরমার নাকে। অজান্তেই আই-ব্রাউ কিছুটা কুঁচকে ওঠে ওর। কেন পরমা কি সোহমের গন্ধে মিশে থাকা তুলুর আঘ্রাণ পাবে বলে অতটা কাছে চলে গিয়েছিল তার? কিন্তু না পেয়ে কিছুটা ব্যথিত সে! সমস্ত অভাব আর অভিযোগকে নিজের উপস্থিতি দিয়ে ভরে দিতে জানে এই মেয়ে। তাই- আরও একটু বাচালতা পেয়ে বসে যেন ওকে। সোহমের চোখে চোখে রেখে বলে- 'কি একটু ঘুমিয়ে নেবে নাকি লাঞ্চের আগে?' সোহম কিছুটা থতমত খেয়ে তাকাতেই আবার বলে- 'আরে, কবে থেকে তো সেই অনিয়মে চলছো। হিসেবে করেছো কি অ্যাভারেজ ক'ঘণ্টা ঘুমিয়েছো? আবার এমআইটি-তে ফিরে গেলেই তো সেই ভয়ংকর রুটিনে ঢুকে যেতে হবে। তাই একটু অসময়ে ঘুমিয়ে নিলে তোমার খারাপ লাগার কথা নয়।' সোহম যেন সমস্ত কথাগুলোকে না গিয়ে গলার কাছে আটকে রেখেছে। কিছুতেই এই বুদ্ধিমতী সুন্দরী বৌদির হালকা হাওয়ার জালে ধরা দেওয়ার মানুষ সে নয়। তাই বলে- 'না, আমার সান-লাইটে ঘুমোবার কোনও হ্যাবিট-ই নেই।' 'ওহ! তোমাকে বোধহয় রাত জেগে কাজটাজ তেমন করতে হয় না?'

তা হয়।

তখন?

আমি তো ৭০/৮০ আওয়ার্স-ও এক সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু দিনের বেলায় ঘুমাতে যেতে আমার একেবারে ভালো লাগে না। ইনফ্যাক্ট আমি বেডরুমের থেকে অনেক বেশি প্রেফার করি স্টাডি আর লিভিংরুমে সময় কাটাতে।

তোমার নিজের বাড়িতে কী ব্যবস্থা, তা অবশ্য আমি জানি না পুরোটা।

কিন্তু আমাদের বাড়িতে এই মুহূর্তে যে কয়েকজন গেস্ট আছেন তাতে তোমাকে তো ভাই লিভিংরুমে পুরো সময় কাটাতে দিলে কি তুলু মেনে নেবে?

শি ক্যান টেইক রেসট, ইফ শি উইশেস্। আমার কোনও সমস্যা নেই।

আরে বাবা, বিয়ের পরপর এত আমার কি। আমাদের বলতে হয়।

সরি, আই ডিড্ন্ট মিন দ্যাট্।

আই নো, হোয়াট ডিড ইউ মিন। এবার আমি যা বলছি শোনো। আমার সঙ্গে ওপরে চল। তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। চেঞ্জ করে নাও। তারপর যা ভালো লাগে কোরো। তুলু স্নানে ঢুকেছে। আমি দেখে আসি ওর কিছু চাই কিনা।

দিস ইজ হার ওউন হাউস। সি মাস্ট নট ফিল আনকমর্ফটেবল।

ঠিক, তা না। বিয়ের পর এই প্রথম এল বাড়িতে। আমাকে ছেড়ে খুব বেশি তো থাকেনি আগে। তাই আমি জানি ওর কখন কী লাগতে পারে। আরও নিজে সব বলে না বলে ওকে আরও বেশি সাপোর্ট দিতে হয় সব সময়।

ইউ আর সিম্পলি গ্রেট বৌদি।

সেটা আমি জানি। দেখছো না, যতক্ষণ না তুমি এটা বলছিলে, আমি তোমার সঙ্গে ছাড়ছিলাম না।

ইভন্ আই অ্যাম এনজয়িং ইয়োর কম্পানি।

ইউ শুড।

পরমার চোখের হাসির এই বহুস্তর কথামালা পড়ে ফেলা অর্থনীতির ফেলো সোহমের পক্ষেও যে কতটা কঠিন, তা সে টের পাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু

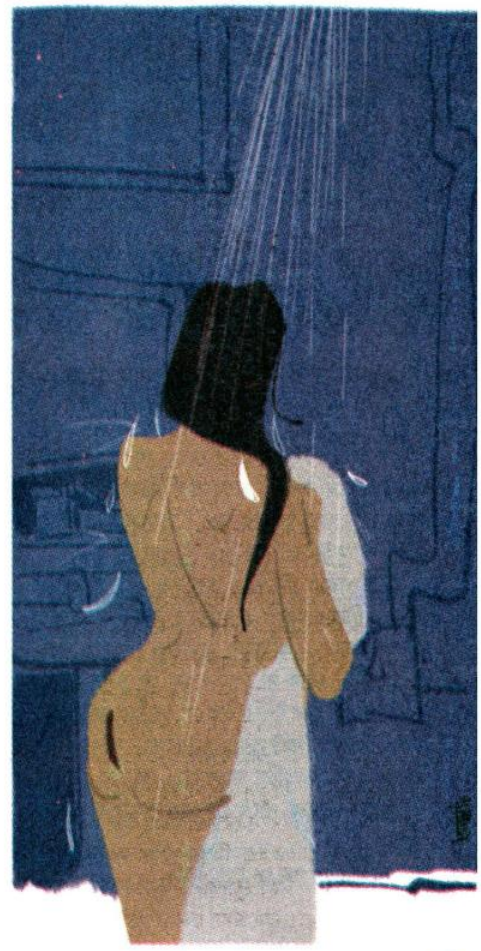

কোনও কঠিন ব্যাপারে আটকে থাকার ছেলে নয় সে। আবার মনে মনে একটা ভয় কি বাসা বাঁধছিল তার! পরমা কি সব জেনে ফেলেছে? আর তাই একটু করে ট্র্যাপ করতে চাইছে ওকে। তুলুকে নিয়ে ওর দাদা-বৌদির যে বাড়াবাড়ি রকমের অ্যাটাচমেন্ট আছে এটা সোহোম নয় শুধু ওদের বাড়ির সবার প্রায় জানা হয়ে গেছে। তাই সোহমের মাও যেন একটু দূরত্ব মেইনটেন করছেন ওদের সঙ্গে বৌভাতের পরদিন থেকে। ওরা নিজেরাই যেন নিজেদের আচরণে স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। সোহমের শুধু মনে হয় আর কত ঘণ্টা এখানে এদের মধ্যে থাকতে হবে কে জানে। কব্জির ঢলঢলে ঘড়িটাকে কিছুটা সামনে ঘুরিয়ে সময়ের কাটা পড়ে নিতে গেলে পরমা আবার বলে ফেলে- ঠিক কটায় লাঞ্চ করো তোমরা? আমরা এমনিতে রেডি।

আরে, না, না, এই তো ব্রেকফাস্ট হল। আর আমি খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব একটা সময় কাটাতে ভালোওবাসি না। যেন নিজেকে গোটাতে চাইছে সোহোম লাটাই উল্টো ঘুরিয়ে। এই আকাশে পরমাই শ্রেষ্ঠ পতঙ্গ! সেখানে লড়াই চালাতে গেলে ভোকাট্টা হওয়া ছাড়া গতি নেই। তাই কিছুটা সাবধানী যেন সে। যেন সাইড লাইনে বসে কাটিয়ে দিতে চায় সে এবারের পুরো ম্যাচটা। একবার এই বাড়ি, এই দেশ থেকে অনেকটা দূরে চলে যেতে পারলে, কিছুটা সময় পেয়ে যাওয়া যাবে সে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার। আর তুলুকে তো ইতিমধ্যেই বলেছে- 'আই অ্যাম ট্রাইং। প্লিজ গিভ মি সাম টাইম।'

কিন্তু পরমা বৌদি যে তুলু নয়, এটা বুঝেছিল সোহম বিয়ের আগে এ বাড়িতে প্রথমদিন এসেই। তুলুর বায়ো- কেমিস্ট্রির এমফিল পেপার যতই ইন্টারেস্টিং হোক না কেন পরমা যে তুলুর আসল রিসোর্স এটা টের পেয়েছিল সে খুব অল্প কথা বার্তা চালাচালিতেই। তাই সবচেয়ে সাবধানে থাকতে চায় সে এই বৌদিরত্নটির ব্যাপারে। চোখের পাতার ওঠাপড়া পড়তে পারে যে- সে সহজেই বলতে পারে-

এমআইটির গল্প শুনবো কিন্তু।

গল্প?

হ্যাঁ, গল্প। চমস্কি, থেকে অমর্ত্য সেন- কী সব লিভিং লেজেন্ড! এঁদের চোখে দেখাও তো বড় কথা। তাই তোমার কাছ থেকে শোনার ইচ্ছে খুব।

আজকাল গ্লোবাল ভিলেজে এসব আর তেমন টানে নাকি মানুষকে?

কেন টানবে না?

ইন্টারনেটে-ওয়েবসাইটে থাকে না এমন তথ্য নেই। তাই।

ধুরঃ! সামনে জীবন্ত মানুষগুলোকে দেখা আর ই-রিলেশন এক হল নাকি!

তা নয়। তবে ওরা ওখানেও কি আর আমাদের সঙ্গে এসে বসেন ব্রেকফাস্ট না ডিনার টেবল্-এ? বসেন না বুঝি কখনও?

আমি তেমন পাইনি। তবে সেমিনার টেমিনারে সামনে থেকে দেখেছি। কথাও হয়েছে কখনও দু-একটা।

সেটাও কী কম! জানো, আমরা একবার চাঁদিপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন তপন সিন্‌হা ওখানে শুটিং করছিলেন 'এক ডক্টর কী মৌত্'। শাবানা আজমী, পঙ্কজ কাপুর এঁদের সঙ্গে আমরাও ছিলাম পান্থনিবাসে। আমারা তো লক্ষ রাখতাম কখন ওদের মেক-আপের বাইরে এক ঝলক দেখবো। ডাইনিং হলে ওরা খেতে বসতো বেতের চিকের আড়ালে। আমরা ওদের হাসি-ঠাট্টার ঠুংঠাং শুনতে পেতাম। কিন্তু ঠিক কাছ থেকে দেখা যাকে বলে সেটা হত না।

কেন সামনে গিয়ে কথা বলে আসতে পারতেন।

সে তো পারাই যেত। কিন্তু সেও সেই ফ্যানের সামনে ধরা পড়া সেলিব্রিটির এক্সপ্রেশন! সেটা ঠিক মানুষটাকে চেনায় না। কিন্তু ফ্যানরাও আসলে খোঁজে সেলিব্রেশনের ভিতরে থাকা আসল মানুষটাকে!

তা আপনার সেই আসল মানুষ দেখা হল না সেবার বলছেন!

আমার থেকেও অনেক বড় বড় ফ্যান ছিল সেবার আমাদের গ্রুপে। শাবানা আজমীর একটা ঝলক, এক টুকরো হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গীতে বিবশ হয়ে যাওয়ার মতো পুরুষও ছিল গোটা দুই।

তারাও আপনার মতো আড়ালেই থেকে গেল সারাটা সময়?

না, হঠাৎ করেই একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল। আমরাও বারান্দায় আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ শাবানা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করেছিল পঙ্কজের সঙ্গে। আর সেই থামের আর এক পিঠে ঠেস দিয়েছিল আমাদের গ্রুপের একটি ছেলে। কিন্তু সে কী তার উত্তেজনা!

কম বয়সে ওসব বোধহয় সবারই হয়।

তোমার এখনকার বয়স তার চেয়ে অল্প কিছুটা বেশি হলেও সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের কন্ট্রোলে রাখার সময় আসেনি এখনও।

সে তো মানুষের সারা জীবনে কখনই আসে না। রিয়েলি?

তাই তো মনে হয়!

সাহসা পরমার কথার বলয়ে ঢুকে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছিল সোহম। টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের কোটরে ফিরে আসার তাগিদ বোধ করে সে। জানে তুলু যা পারেনি। পরমার সেই কাজ করতে খুব বেশি সময় লাগবার কথা নয়। কিন্তু এযাত্রা নিজেকে বাঁচাবে বলে প্রাণপণ চেষ্টা যেন তাঁর। তাই সাবধানে সিঁড়ির রেলিং-এর উডেন কার্ভে আঙুল চালাতে চালাতে দোতলার দিকে উঠতে থাকে সে। পরমার শাড়ির উজ্জ্বল মেরুন রং আর হলুদ পাড় দক্ষিনী সুতি শাড়ির আসাধারণ ফল চোখের ফ্রেমে এঁটে থাকে তার। তুলু বেশ সুন্দরী। কিন্তু পরমা যেন শুধু সুন্দরী নয়। আরও বেশি কিছু। মনে মনে ভাবে বিয়ের বারো বছরের ভ্যালু অ্যাডিশনটা তো কাউন্ট করতেই হবে। তুলু তো সেখানে নভিশ্! আর গত সতেরো দিনে যা যা ঘটেছে ওর সঙ্গে নেহাতই পরমা স্কুলের ছাত্রী, তাই এখনও হারটাকে স্বীকার করছে না। ওয়েট করছে- সামহাউ এনি চেঞ্জেস উইল কি দেয়ার ভেবে। ❖

তুলু বেশ সুন্দরী। কিন্তু পরমা যেন শুধু সুন্দরী নয়। আরও বেশি কিছু। মনে মনে ভাবে বিয়ের বারো বছরের ভ্যালু অ্যাডিশনটা তো কাউন্ট করতেই হবে। তুলু তো সেখানে নভিশ্! আর গত সতেরো দিনে যা যা ঘটেছে ওর সঙ্গে নেহাতই পরমা স্কুলের ছাত্রী, তাই এখনও হারটাকে স্বীকার করছে না।

চলবে

অলঙ্করণ: তাপস মণ্ডল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রকর ও সাহিত্যস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। তার পাশাপাশি শিশুদের জন্য তাঁর লেখা ও আঁকা সর্বোপরি বর্ণশিক্ষার অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

‘হুঙ্কার সিং’ মস্তকে হুঙ্কার

সু দী প চ ক্র ব র্তী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রাক্ষর ও অন্যান্য
ভূমিকা ও সংকলন : আবীর কর
ভাষাবন্ধন প্রকাশনী
৩/৫২, বিজয়গড়, কলকাতা - ৩২
১০০ টাকা

সকলেই তো জানেন ‘হুঙ্কার সিংহ’-এর ডাক হাঁক শুনে যারা ভয় পায় তাদের ‘মাথাটি খায় সিংহ’, আর যারা হুঙ্কারের সামনে হাঁক ডাক করে তাদের বই এনে দেয় সিংহ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে এ গল্প লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শিশু শিক্ষার নানা সরল পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু তার কতটুকু আমরা নিলাম? বিদ্যার্থীদের ঢাউস- ঢাউস ব্যাগগুলি কী প্রমাণ দেয়?

এইসব কূট প্রশ্ন ছেড়ে আমরা অবন ঠাকুরে ফিরি।

অবন ঠাকুর লেখা আঁকেন আর ছবি লেখেন—এ তো প্রচলিত প্রবাদ। চিত্রকর ও সাহিত্যস্রষ্টা অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। তার পাশাপাশি শিশুদের জন্য তাঁর লেখা ও আঁকা সর্বোপরি বর্ণশিক্ষার অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই অভাব মেটাতে একটি চমৎকার উদ্যোগ নিয়েছেন আবীর কর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাক্ষর ও অন্যান্য’ নামে একটি বইয়ের সঙ্কলক হিসাবে কাজ করেছেন তিনি। অলকেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদিত 'চিত্রাক্ষর', অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'রেখাক্ষর বর্ণমালা', এবং শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী সম্পাদিত 'চিত্রে বর্ণমালা' রচনাগুলির সহায়তায় আবীরবাবু তৈরি করেছেন এই বই। এই বইটি হাতে নিয়ে একই সঙ্গে আনন্দ আর আফশোস দুই-ই হল। আমরা শৈশবে এরকম একটি বই পেলাম না বলে আফশোস, আর আনন্দ এই কারণে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম চাইলেই এরকম একটি বই হাতে পেতে পারে।

'বর্ণপরিচয়', 'সহজপাঠ', 'কিশলয়' ঘিরে ছিল আমাদের শৈশব। আমার মতো অনেকেই হয়তো যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' প্রথম ভাগ কিংবা দ্বিতীয় ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'শুনি দেখি পড়ি লিখি'-র খোঁজ ক'জন রাখেন? অবনীন্দ্রনাথের 'চিত্রাক্ষর' ও 'রেখাক্ষর' থেকে শিশুদের বঞ্চিত করবেন না। স্বর বা ব্যঞ্জনের এক একটি বর্ণ দিয়ে অনবদ্য সব ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি আমাদের। ছবিগুলির মধ্যে থেকে বর্ণ আবিস্কার শুধু ছোটদের কেন বড়দেরও খুব ভালো লাগবে। 'গোমড়া 'থ'-এর হাঁসের মতো মাথা/ দন্ত্য 'স' নিজেই সাদা ছাতা' 'রেখাক্ষর'-এ ব্যঞ্জনবর্ণ অংশে এরকম দুটি ছড়ার উদাহরণ দিয়েছিলেন অমিতেন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ছবি ও ছড়া দিয়ে অ, আ লেখা তাস বানাতে। অবনীন্দ্রনাথের সব কাজের মতো 'চিত্রাক্ষর'-এরও উৎসাহদাতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে জার্মান অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ঠিক করে অলোকেন্দ্রনাথ ছাপেন 'চিত্রাক্ষর'। যদিও নামমাত্র সংখ্যাই ছাপা হয় তা।

এই সমস্ত ঘটনা, বিবরণ, বিশ্লেষণ পাওয়া গেল 'চিত্রাক্ষর ও অন্যান্য' বইয়ে। সঙ্গে ছবিগুলি ছাপা হয়েছে সযত্নে। প্রচ্ছদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভূতপতরীর দেশে'-র শব্দচিত্র। আখ্যাপত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি শিউলি সমগিরির।

অসাধারণ এরকম একটি বই প্রকাশের জন্য ভাষাবন্ধন প্রকাশনীকে ধন্যবাদ। লেখাটি শেষ করার আগে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (বিরু) লেখা অবনীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ না করে পারছি না। অবন ঠাকুর চিঠিতে লিখছেন— 'ভাই বীরুবাবু এইবার ছবির নওরাজ পাঠালুম, রুটি বিস্কুটের ভোজ দিয়ে এটা খেয়ে ফেল না যেন- রেখে দিও এবং এঁকে নিও।' ❖

নচিকেতা জিতে গেলেন

'পাওনাদারের অভিশাপ শুনে জেরবার হয় বুড়ো বাপ / আমি তো তখন পারব না খেতে চাইনিজ বারে চাউমিন...'

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

নচিকেতার গানের সঙ্গে আমার পরিচয় কোনও এক পুজোর কয়েকদিন আগে। এক বন্ধু বলেছিল, ওই গানটা শুনিস। কেঁপে যাবি। তো, শুনেছিলাম সেই গান, 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়' এবং আরও অনেক গান, যার মধ্যে শুধু 'নীলাঞ্জনা' নয়, 'অন্তবিহীন পথ চলাই জীবন' বা 'তুমি কি আমায় ভালোবাসো'র মতো গানও ছিল। সত্যি বলতে কী, কেঁপেই গিয়েছিলাম। সেই কাঁপা শুধুমাত্র কণ্ঠসামর্থ্য বা লিরিক্স কিংবা সুরের জন্য নয়। সেই কেঁপে যাওয়ার মূল কারণ ছিল নচিকেতার একটা ভঙ্গি। যার এক ও একমাত্র নাম, সাহস। সেই কাঁপুনিই যেন ফিরে এল পত্র ভারতী প্রকাশিত 'নতুন নচিকেতা অমনিবাস'-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে। সেই নচিকেতা, যিনি অবলীলায় প্রেমিকাকে বলতে পারেন, 'যখন আমার ঘরেতে আঁধার নেই একফোঁটা কেরোসিন / পাওনাদারের অভিশাপ শুনে জেরবার হয় বুড়ো বাপ / আমি তো তখন পারব না খেতে চাইনিজ বারে চাউমিন...' যেন পাচককেও খোলাখুলি বললেন, যখন আমাদের চারদিকে চাপ চাপ রক্ত, বিস্ফোরক আর হতাশায় ভরে উঠেছে বাতাস।

সত্যি করেই নচিকেতার সঙ্কলিত লেখাগুলো এক একটা ধাক্কা, কখনও বা সপাটে চড়ও। যখন বয় মিটস গার্ল জাতীয় খেলো লেখা কিংবা সস্তার এক্সট্রাম্যারিটাল বা সফ্‌ট পর্নোগ্রাফিকে পাম্প দিয়ে মহৎ সাহিত্য বানানোর কসরত চলছে, তখন নচিকেতার এক-একটা গল্প পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় আজকের গল্প আদতে কেমন হওয়া উচিত। কী আছে সেই গল্পে? উত্তরে বলতে হবে, কী নেই? আছে, 'শর্টকাট বিন্দু', যে প্রতিদিন তিন-চারটি করে গাড়ির সামনে ঝাঁপায়, আর তারপর সেইসব গাড়ির মালিকদের চেপে ধরে আদায় করা টাকায় অন্নসংস্থান হয় ঝুপড়িবাসী অনেক মানুষের (শর্টকাট)। আছে বাবলি নামের মেয়েটা, যে সিনেমার নায়িকা হওয়ার আশায় ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রোডিউসার সুবীর বাজোরিয়া থেকে মাফিয়া ডন আফতাব কুরেশির শয্যাসঙ্গিনী হয়েও যে স্টারডমের পিচ্ছিল রাস্তা বেয়ে উপরে উঠতে পারে না, নীচে গড়িয়ে যায়, আর তখনই আবিষ্কার করে, তার পাশে কেউ নেই (ছায়াজগৎ) আছে সূর্য, যে প্রতিভার জোরে খ্যাতির শিখরে উঠেও ভুলতে পারে না তার শিকড়। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, সবার জন্য না বেঁচে নিজের জন্য বাঁচতে হবে, এই নির্মম-নিষ্ঠুর পৃথিবীতে সারভাইভ করতে হলে। আর এই অমনিবাসে নচিকেতার যে দু'টি উপন্যাস আছে, তাদের অবশ্য উপন্যাস না বলে অণু উপন্যাস বলাই ভালো। তাই গল্প বলে দিয়ে পাঠকের আকর্ষণ নষ্ট করে দিতে চাই না। শুধু বলব, 'ক্যাকটাস' উপন্যাসে প্রভাসবাবুর চরিত্রটা পুরোনো জমাটি বাংলা উপন্যাসের মৌতাত ফিরিয়ে আনে। আর 'জন্মদিনের রাত' উপন্যাস থ্রিলের দিক দিয়ে বিদেশি উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়।

নচিকেতার সব রম্যরচনা অবশ্য রম্য নয়। কোনও কোনও লেখার তীব্র স্যাটায়ার পাঠককে নড়েচড়ে বসতে রাজি করে। পলিটব্যুরোর সঙ্গে গণেশের তুলনায় কিংবা এসএমএসের মাধ্যমে শিল্পী নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে তুলোধনা করার সময় নচিকেতার কলম যেন ব্যঙ্গবিদ্রুপে ঝলসে ওঠে। প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা বিনি সুতোয় যেভাবে গেঁথে তোলেন নচিকেতা, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন আর শিউরে উঠতে হয় যখন রিয়্যালিটি শো-এর ক্রীতদাস বাচ্চাদের পারফরমেন্স উপভোগ করা দর্শকদের দিকে, যার মধ্যে আমি-আপনিও আছি? নচিকেতা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'আমরা কি সবাই পিডোফিলিয়ায় ভুগছি?'

এই অমনিবাসে সঙ্কলিত তাঁর গানগুলোও শিল্পী নচিকেতাকে চেনায় আবার, তবু এই অমনিবাস পড়া পাঠকের দাবিকেও মর্যাদা দিতেই হবে লেখক নচিকেতাকে। পত্র ভারতী প্রকাশন যে ভিন্ন ধারার একটি বই পরিপাটিভাবে প্রকাশ করেছে, তার জন্য তাদের একটা বড়সড় ধন্যবাদ প্রাপ্য। ❖

নচিকেতা অমনিবাস/নচিকেতা/
পত্রভারতী/১৮০টাকা

গোড়ভাঙ্গার পথে বিপথে

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

নাজিরপুর পৌঁছে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তায় চার কিলোমিটার এগোলেই গোড়ভাঙা। এখানে বেশ কিছু ফকিরের বাস। শোনা যায় আজহার ফকির প্রথম এই ফকিরি গ্রামের পত্তন করেন।

সুফি ফকিরালি কোনও ধর্ম নয়। বরং ধর্মের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করাই এর আদত। সেখানে কোনও ঈশ্বর নেই, আচার নেই। ধর্মীয় অনুশাসনকে তোয়াক্কা না করে মানবিক এক জীবনচর্যায় সাধন-ভজনকে এমন একটা পথে নিয়ে যায়, যেখানে মন ও দেহকে একাকার করে এক মুক্ত জীবনের গান গেয়ে ওঠে সমগ্র সত্তা। আউল-বাউল-ফকির আসলে এমন এক গুহ্যসাধনার মধ্যে নিজেকে খোঁজে, যা আপাত প্রচ্ছন্ন হলেও প্রকাশ্য। হয়তো সাধারণ মনে তাকে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হয়। এটাও ঠিক যে আমাদের আরবান পাঠক্রম দিয়ে একে ছোঁয়া যায় না, দুরূহ মনে হয়। তবে লোকায়ত ভাষার রূপক ও চিত্রকল্পের অন্দরে প্রবেশ করতে পারলে এদের তত্ত্বসাধনার ধরনধারণকে উপলব্ধি করা যায়। তাই এ কথা লিখলে ভুল হয় না যে এই ভাষার কোনও অস্পষ্টতা নেই। যেমন কোনও বিভেদও নেই। ধর্মের বিচার নেই, জাতির প্রভেদ নেই। মানুষই এই সাধনতন্ত্রের একমাত্র ধ্রুবক। এঁদের এককথায় বলা যায় যে এঁরা হলেন লৌকিক উপাসক। এখানে দুদ্দু শাহ ফকিরের একটি পদ উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আমার কোনও জাতি-গোত্র নাই / দিয়ে মানুষের দোহাই, মানুষের বন্দনা গাই।' হ্যাঁ, এটাই হল অন্যতম মূল কথা।

গাড়ি চালাতে চালাতে এই কথাগুলোই ভাবছিলাম। যখন আমার আর চারজন সহযোগীর চোখ লেগে আসছে বা খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। আমাদের গন্তব্য গোড়ভাঙা, নদিয়া জেলার প্রত্যন্তে। কলকাতা থেকে প্রায় দু'শো দশ কি পনেরো কিলোমিটার হবে। কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর রোড ধরে সত্তর কিলোমিটার গিয়ে নাজিরপুর। নাজিরপুর পৌঁছে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তায় চার কিলোমিটার এগোলেই গোড়ভাঙা। এখানে বেশ কিছু ফকিরের বাস। শোনা যায় আজহার ফকির প্রথম এই ফকিরি গ্রামের পত্তন করেন। সে সময় মৌলবাদী মুসলিম ও গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে তাঁকে যথেষ্ট লড়তে হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এই গ্রাম ফকির গ্রাম হিসেবেই পরিচিত হয়ে ওঠে। আজহার ফকির প্রয়াত হয়েছেন বা লোকায়ত ভাষায় দেহ

রেখেছেন। প্রাচীন এই ফকিরের প্রতি আজও মান্যতা অটুট থেকে গেছে।

কিন্তু ফকিরসমাজ, ফকির গ্রাম মানে তো শুধুই গান নয়, শুধুই তত্ত্বসাধনা নয়। এখানে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার প্রশ্নটিও জড়িত। একটা উন্নত জীবনধারাকে সংগঠিত করতে না পারলে গানও যাবে, তত্ত্বও যাবে, যাবে এই কৌমসমাজের জীবনচর্যাও। সেই কারণেই মনে হয় চারদিকে যে গ্রাম পতনের মুহুর্মুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেখানে উন্নয়নকে, বিকাশকে দশামুক্ত করতে হবে। এইসব আধা-রাজনৈতিক কথা বলতেই হচ্ছে, বলতেই হচ্ছে যখন দেখছি এই গোড়ভাঙা গ্রামও এই প্রশ্নে মিলিত হয়েছে। বাংলা নাটক ডট কম-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক অমিতাভ ভট্টাচার্য তাঁদের সংগঠিত এক ফকির মেলা, যা এই গোড়ভাঙাতেই প্রতি বৎসর আয়োজিত হয়, তার সম্পর্কে আমাকে এক চিঠিতে (পাঠক মেইল পড়তে পারেন) লিখেছেন, 'ইট'স নট আ সাধুসঙ্গ, রাদার ইট'স অ্যান অ্যাটেম্পট অব ডেভেলপিং কমিউনিটি লেড মিউজিক ট্যুরিজম ইনিশিয়েটিভ অ্যাট গোড়ভাঙ্গা...।' এটাই আসল কথা। সাধুসঙ্গ, মেলা-মচ্ছব করবে এই অন্ত্যজ সমাজ। আর তার প্রতি, মানে সেই সমাজের প্রতি, গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতি যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে, তবে ডেভেলপমেন্টের কাজটি সুপরিকল্পিতভাবে শুরু করে দেওয়া উচিত। আমার ধারণা, অমিতাভর নেতৃত্বে বাংলা নাটক ডট কম সেই কাজটিরই সূচনা করেছে। অনেটা পথ হেঁটেছে তারা, তাদের আরও পথ হাঁটতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কী করছে অমিতাভরা? শুনলাম প্রায় গোটা গ্রাম জুড়ে স্যানিটারি সিস্টেমের ব্যবস্থা করছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নিচ্ছে। উপার্জনের ব্যবস্থা করছে। ফকিরদের সারা দেশে, এমনকী বিদেশে যাওয়ার, গান শোনানোর আয়োজন করছে। বিদেশ থেকে মিউজিশিয়ানদের নিয়ে আসছে ফকির উৎসবে। সেখানে মিউজিক্যাল ইন্টার‍্যাকশনে গ্রাম-শহর মিলে যাচ্ছে, দেশ-বিদেশ একাকার হয়ে যাচ্ছে। এসবই কিঞ্চিৎ দেখা আর সবটাই শোনা। আসলে ওদের ওই ফকির উৎসব দেখতেই গোড়ভাঙায় যাওয়া। কিন্তু গিয়ে শুনি এক মাস আগেই সেই উৎসব শেষ হয়েছে। এখন যে উৎসব চলছে তা সেই আজহার ফকিরের দিবসী। যার মূল তত্ত্বাবধানে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র মনসুর ফকির। সে যাই হোক, এ আমারই অজ্ঞতা, আমারই না জানার ফল। কিন্তু পৌঁছে যখন গেছিই, তখন ক্ষতি কী! এবার পাঠক, ক্রমে বলব কী দেখলাম আর কী ঘটল সেই প্রাচীন ফকির আজহার ফকিরের স্মরণ উৎসবে।

আগেই বলেছি যে আউল-বাউল-ফকির হল বিভেদ বিরোধী এক সমন্বয়ের বার্তা, যারা গানে ও জীবনচর্যায় প্রসারিত করে যায়। সেই বার্তা যেন বলে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করাই এই জীবনধর্মের কাজ, লোকচর্যার কাজ। কিন্তু এ তো দেখি অন্য আসর, অন্য কেলো, যাকে বলে কেলেঙ্কারি। পাঠক, এটা আমার অ্যাজেন্ডা বা যাকে বলে প্রতিবাদ— তা হল, শহরকেন্দ্রিকতা শুধু নয়, বিভেদ আর ফান্টিনস্টি, বাওয়াল আর পান্টারবাজি, মাতলামো আর ভণ্ডামি, লোক দেখানো বাউল-ফকিরবাজি (পাঠক, এখানেও ফাউলবাজি পড়তে পারেন)। ভরসন্ধ্যায় পৌঁছে দেখলাম মনসুর ফকির— আগেও লিখেছি খুব পরিশীলিত একজন পারফরমার তিনি আপ্যায়ন করে বসালেন। তখনও সন্ধ্যা নামেনি। আজহার ফকিরের সমাধির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ফুল দিয়ে, কাগজ কেটে, রংবেরঙের কাপড় দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো। অধ্যাত্ম বা ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু নরম মোমের আলো আর ধূপের সুগন্ধে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়। যাই হোক, ওদিকে আসরের ব্যবস্থা রয়েছে। মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা হচ্ছে কলকাতা

আউল-বাউল-ফকির হল বিভেদ বিরোধী এক সমন্বয়ের বার্তা, যারা গানে ও জীবনচর্যায় প্রসারিত করে যায়। সেই বার্তা যেন বলে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করাই এই জীবনধর্মের কাজ, লোকচর্যার কাজ।

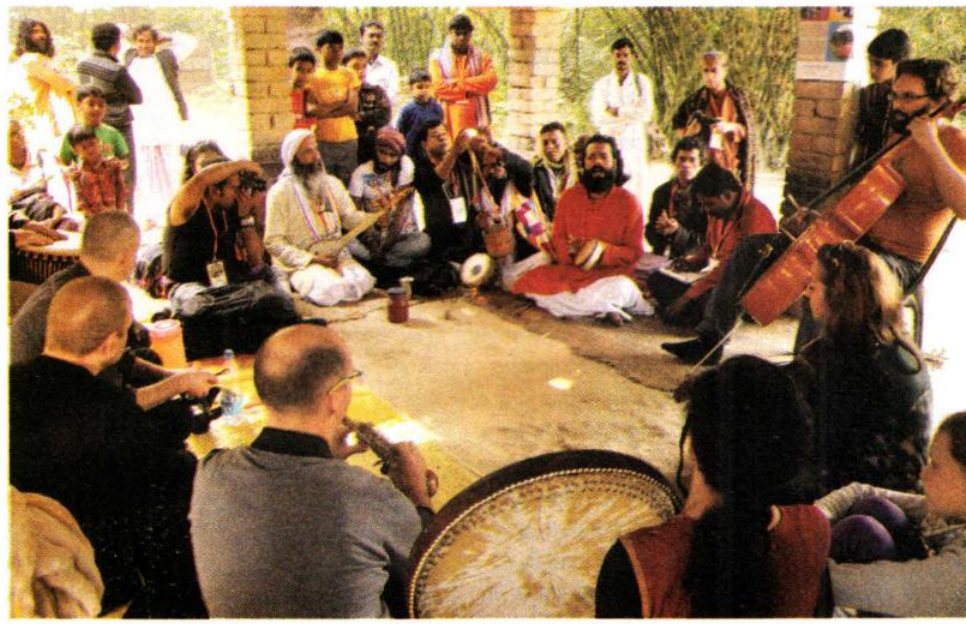

থেকে কিছু সম্মানীয় অতিথি আসবেন, তারপরই নাকি উৎসবের শুরু হবে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় সন্ধ্যা ক্রমে জমাট হল। একটু এদিক-সেদিক ঘুরে দেখলাম এই গোড়ভাঙা ফকিরি গ্রাম। বুঝলাম বাংলা নাটক ডট কম বেশ জুতসই একটা সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেছে, যেমনটি আমি মেদিনীপুরের নয়াগ্রামেও দেখেছি। সেখানেও এই সংস্থা পটুয়াদের জন্য একটা রিসোর্স সেন্টার তৈরি করেছে। তবে গোড়ভাঙার বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানে পাশাপাশি তৈরি হয়েছে একটা বিরোধের প্রাচীর, যা কোনওমতেই অভিপ্রেত ছিল না। এখন কী করা যাবে। আমরাই যদি শহর থেকে গিয়ে এদের মধ্যে প্রভেদের বীজ বুনে দিই, তবে ফকিররাই বা কী করবে আর বাংলা নাটক ডট কম-ই বা কী করে তা ঠেকাবে?

ইতিমধ্যে শাঁই শাঁই গাড়ি নিয়ে কলকাতার তথাকথিত বাবুসমাজ হাজির। উৎসব উদ্বোধনে সকলের ডাক পড়ল মঞ্চে সাজানো চেয়ারে উপবিষ্ট হতে। অধম এই কলমচিও বাদ গেল না। প্রায় সবাই মঞ্চে উঠে দু'চার কথা বলল। একমাত্র আমি গেলাম না। তার কারণ যেমন উচ্চকিত ভাব আমার আজকের স্বভাব বিরোধী, তেমনই বিভাজনপন্থার বিরুদ্ধাচরণ। ততক্ষণে কলকাতা থেকে আগত ছেলেপিলেরা উৎসবের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। মনসুর ফকিরকে দিয়ে বলানো হল যে কোনও এক সংস্থা না তার নিয়ন্ত্রক দেব চৌধুরী নাকি বাউল-ফকিরদের জন্য অনেক কিছু করছেন। তা প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য হলেও মেনে নেওয়া গেল। তারপর মনসুর বললেন যে এরা বিভিন্ন বাউলের পেনশনের ব্যবস্থা করেছে। তালের আসর বেতালা হয়ে যাবে বলে আমি কিছু বললাম না। আজ এই কলাম মারফত প্রশ্ন রাখছি, দেববাবু কি সেইসব বাউল ও ফকিরের ঠিকানা জানাবেন, যাদের পেনশন দেওয়া হচ্ছে? মাথায় থাকা ভালো যে 'পেনশন' শব্দের একটা ভার মায় ওজন আছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা যদি এমন ব্যবস্থা করে থাকে, তবে তা জানতে চাই। কেননা এ সমস্তই আমার ব্যক্তিগত ও দীর্ঘদিনের গবেষণা পরিধির অন্তর্গত। একটু ফকিরি কায়দায় বলি, 'কে সে মানুষ আমি দিদার পেলাম না / এমনধারা আন্দাজি কথা আমি তো শুনব না।'

এর পরের অধ্যায় অত্যন্ত লজ্জাজনক। যা দিয়ে এই উৎসবের কথা শুরু করেছিলাম। প্রাথমিকভাবে দু'একজন ফকির গান গাওয়ার পরই কলকাতার ছেলেছোকরাদের উদ্দাম নৃত্য শুরু হল। এক্কেবারে সোজা মঞ্চে উঠে কখনও একতারা, কখনও ডুবকি নিয়ে এরা নাচতে আরম্ভ করল। দর্শক-শ্রোতাদের বিরক্ত করতে থাকল অনবরত। যদিও এরা গানবাজনার 'গ' জানে না। যেসব যন্ত্র নিয়ে মঞ্চে উঠে নাচছিল তা এদের জানকারির ঊর্ধ্বে। তবু আকণ্ঠ নেশা করে ফকিরের সাধু আসরকে ক্রমে অসাধু করতে থাকল। বোধ হয় কোথাও একটা বিবেকের নাড়া খাচ্ছিল আমাকে দেখে। ফলে মাঝেমধ্যেই এরা টিপ টিপ করে আমাকে প্রণাম করছিল। একই ছেলে একাধিকবার। নেশার তাড়নায় কি না বলতে পারব না। তবে আসর যে কেবলই আগলছাড়া হচ্ছিল তা বলতে পারি নিশ্চিন্তে। ক্যামেরায় প্রচুর ছবি উঠছিল। একটি বেসরকারি চ্যানেল থেকেও নাকি ক্যামেরা গিয়েছিল। মঞ্চ থেকে সে ঘোষণাও বাদ যায়নি। যদিও সেসব ছবি আমার দেখা হয়নি।

প্রাথমিকভাবে দু'একজন ফকির গান গাওয়ার পরই কলকাতার ছেলেছোকরাদের উদ্দাম নৃত্য শুরু হল এক্কেবারে সোজা মঞ্চে উঠে কখনও একতারা, কখনও ডুবকি নিয়ে এরা নাচতে আরম্ভ করল।

শুধু মনে হচ্ছিল, আমার নিজস্ব ক্যামেরাটা যদি সঙ্গে থাকত। হ্যাঁ, সত্যি কিছুটা ডকুমেন্ট করতে পারতাম এই ভেঙে পড়া কৌমসমাজে কীভাবে ঢুকে পড়ছে লুম্পেন ফক্কিকারি। কারা এইসব কানে দুল পরা নির্বোধ, তারও হয়তো হদিশ পেতে পারতাম। যাক, যা হয়নি, তা হয়নি। সে নিয়ে আপশোস করে লাভ নেই।

রাত বাড়ল, আসর ভাঙল। ঘরে ঘরে ঢালাও বিছানা করে অতিথিদের থাকার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন মনসুর ফকির ও তাঁর ছেলেরা। একসময় সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেরে, অভ্যাগতদের সেবা দিয়ে (খাইয়েদাইয়েও পড়তে পারেন) মনসুর এলেন আমাদের কাছে। আমাদের সঙ্গে চিলেন লীনা চাকি, গবেষক, লেখক। তিনি অনুরোধ করতে প্রায় রাতভর মনসুর তাঁর সুমিষ্ট দোতারার মূর্ছনায় গান শোনালেন। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। মিউজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স।

কিন্তু তার ছিঁড়ে গেল কলকেত্তাইয়া ছোকরাদিগের টিপ্পনীতে। গত মাসের সুসংহত উৎসব নিয়ে নানা মন্তব্য। একবার তো একজনকে ধমক দিয়েই বললাম, নিজেরা কী করলি সেটা আগে দেখ। এই গ্রামের মানুষ বলছে বাংলা নাটক ডট কম-এর কথা, তাদের কাজের কথা। হয় কাজ কর, নয়তো যারা প্রকৃতই কাজ করছে, তাদের সাহায্য কর। আমরা কেন বিভেদ ছড়াচ্ছি? গোলাম ফকির আর মনসুর ফকিরের যদি বনিবনার কোনও অভাব হয়ে থাকে, তা হলে ওঁরাই তা মিটিয়ে নেবেন। আমরা কেন এর মধ্যে ঢুকছি আর মিথ্যের বড়াই করছি? ছেলেটি তখন বেহেড, ফলে বলা-না বলা একই থাকল। আমরা পরের দিন ফিরে এলাম শহর কলকাতায়।

আসার এই দীর্ঘ পথে নানা কথা হচ্ছিল আমার সহযোগীদের সঙ্গে। আর আমি তখন স্টিয়ারিং হাতে গুনগুন করছিলাম এক ফকিরি প্রবচন, 'লোভী গুরু-কামী চ্যালা / ঠেলতে ঠেলতে পুকুরে ফেলা। / শেষে গুরু-শিষ্য দু'জনে কালা।'

কেন? তা বলতে পারব না। ❖

ছবি: লেখক

গত সংখ্যা উদাসী বাবার আখড়ার ছবিগুলি ছিল শ্রেয়া মজুমদারের।

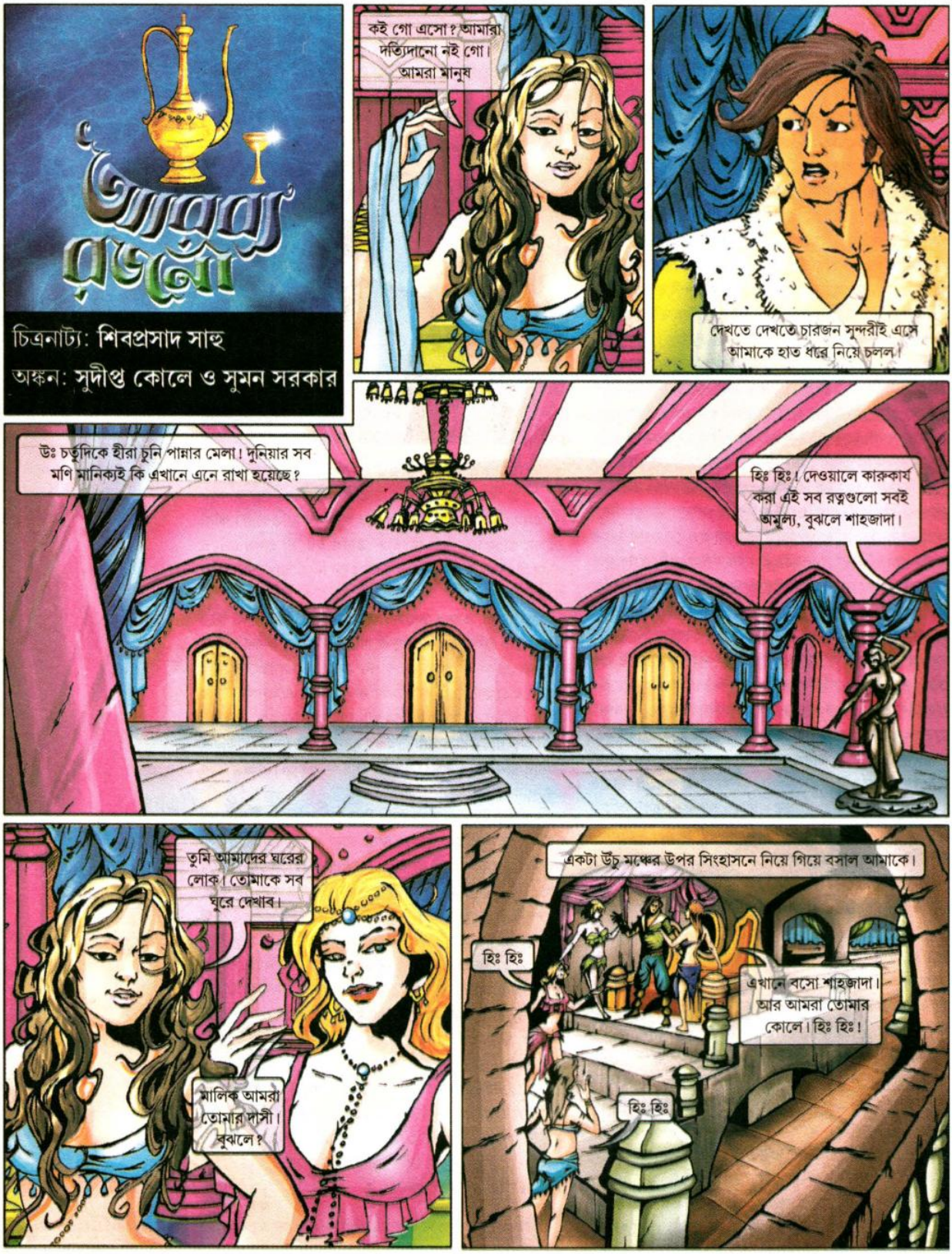
আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
কই গো এসো? আমারা দত্যিদানো নই গো। আমরা মানুষ
দেখতে দেখতে চারজন সুন্দরীই এসে আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলল।
উঃ চতুর্দিকে হীরা চুনি পান্নার মেলা! দুনিয়ার সব মণি মানিক্যই কি এখানে এনে রাখা হয়েছে?
হিঃ হিঃ! দেওয়ালে কারুকার্য করা এই সব রত্নগুলো সবই অমূল্য, বুঝলে শাহজাদা।
তুমি আমাদের ঘরের লোক। তোমাকে সব ঘুরে দেখাব।
মালিক আমরা তোমার দাসী। বুঝলে?
একটা উঁচু মঞ্চের উপর সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে বসাল আমাকে।
হিঃ হিঃ
এখানে বসো শাহজাদা। আর আমরা তোমার কোলে। হিঃ হিঃ!
হিঃ হিঃ

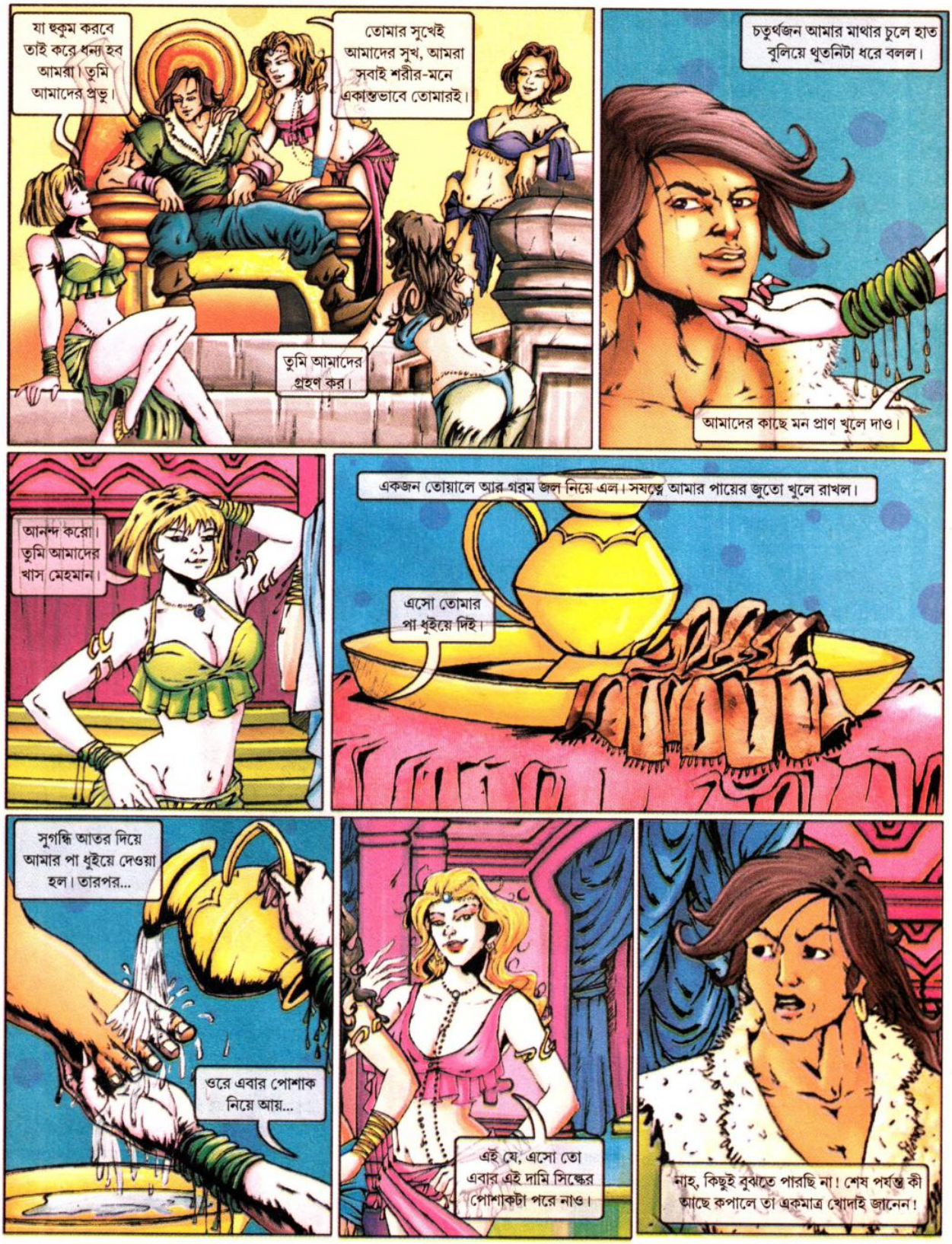
যা হুকুম করবে তাই করে ধন্য হব আমরা। তুমি আমাদের প্রভু।
তোমার সুখেই আমাদের সুখ, আমরা সবাই শরীর-মনে একান্তভাবে তোমারই।
তুমি আমাদের গ্রহণ কর।
চতুর্থজন আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে থুতনিটা ধরে বলল।
আমাদের কাছে মন প্রাণ খুলে দাও।
আনন্দ করো। তুমি আমাদের খাস মেহমান।
একজন তোয়ালে আর গরম জল নিয়ে এল। সযত্নে আমার পায়ের জুতো খুলে রাখল।
এসো তোমার পা ধুইয়ে দিই।
সুগন্ধি আতর দিয়ে আমার পা ধুইয়ে দেওয়া হল। তারপর...
ওরে এবার পোশাক নিয়ে আয়...
এই যে, এসো তো এবার এই দামি সিল্কের পোশাকটা পরে নাও।
নাহ, কিছুই বুঝতে পারছি না! শেষ পর্যন্ত কী আছে কপালে তা একমাত্র খোদাই জানেন!

চলবে

গুরুচরিত

সুব্রত সেন

ক্লাস ইলেভেন-এ পড়ি তখন। আমাদের স্কুলে ক্লাস ইলেভেন-এর ক্লাস সকালে হত, ঘুম থেকে উঠে পাড়ি-মারি করে স্কুলে ছুটতে হত। ওই রকম তাড়াহুড়োয় স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি, এমন সময়ে দরজায় কুট কুট করে মৃদু কড়া নাড়ার আওয়াজ। এই রকম আস্তে আস্তে কড়া নাড়া মানে হচ্ছে আমার কোনও পাড়ার বন্ধু আমাকে ডাকছে জানান দেওয়া।

এই সাত সকালে আমার পাড়ার বন্ধুদের আমাকে খোঁজ করার কথা নয়, তাই অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখি আমার পিসতুতো ভাই গৌতম দাঁড়িয়ে আছে। গৌতম আমার সমবয়সী, পাড়াতেই থাকে, সুতরাং ও সম্পর্কে আমার ভাই হলেও আসলে পাড়ার বন্ধুদেরই একজন। আমি অবাক হয়ে গৌতমের দিকে তাকাতে গৌতম করুণ মুখে বলল, 'উত্তমকুমার মারা গেছে!'

আমি তো হাঁ। উত্তমকুমার মারা গেছে মানে? তার তো মারা যাওয়ার বয়স হয়নি। এ রকম ভাবে দুম করে কেউ মারা যায় নাকি? আমি গৌতমের কথা অবিশ্বাস করলাম, গম্ভীরভাবে বললাম, 'কী সব বলিস! কাগজে কিছু নেই তো।'

আমাদের বাড়িতে ইংরেজি কাগজ আছে, সেই কাগজে সত্যিই উত্তমকুমার সংক্রান্ত কোনও খবর নেই। গৌতমদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে, সে বলল, 'আমাদের কাগজে আছে। প্রথম পাতাতেই আছে।'

গৌতমের শোকগ্রস্ত মুখ দেখে বুঝলাম গৌতম বানিয়ে বলছে না কিছু। আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। কী রকম একটা স্বজন বিয়োগের মত হল।

এই স্বজন-বিয়োগের ব্যাপারটা বোঝানো খুব শক্ত। উত্তমকুমার আমার কেউ না, তাকে কস্মিনকালেও দেখিনি আমি, কিন্তু পর্দায় তাকে দেখতে বারবার ছুটে যেতাম আমি। এবং আমার মতো অসংখ্য লোক। মাধ্যমিকের পরে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অঢেল লাইসেন্স পেয়ে গেছিলাম, সুতরাং মাত্র এক বছরে কত যে উত্তমকুমারের ছবি দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। বাংলায় তখন 'গুরু' কথাটা চালু, আমাদের বয়সীদের কাছে সেই মুহূর্তে তিনজন গুরু। বাংলা সিনেমার উত্তম, হিন্দি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চন এবং গানের জগতে কিশোরকুমার। বলাই বাহুল্য, উত্তমকুমারের মৃত্যুর খবরে কতটা মর্মাহত হয়েছিলাম।

স্কুলে গিয়ে দেখি ক্লাসের কোনও বালাই নেই। টিচাররা ক্লাস নিতে আসছেন ঠিকই, কিন্তু উত্তমকুমারের মৃত্যুতে তাঁরাও আর সেদিন ক্লাস নিতে চাইছেন না। আর ছাত্রছাত্রীদের তো কথাই নেই। নমঃ নমঃ করে স্কুল চলল বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত, তারপর যথানিয়মে ছুটি হয়ে গেল আমাদের মনিং স্কুলের। দোতলা বাসে করে বাড়ি ফেরার সময়ে দেখলাম রাসবিহারী মোড়ের কাছে ভিড় জমতে শুরু করেছে। অনেক মানুষ জমায়েত হতে শুরু করেছেন, উত্তমকুমারকে একবার শেষ দেখা দেখার জন্য। কেওড়াতলা শ্মশানে যাওয়ার ওটাই রাস্তা।

বাড়ি ফিরে স্কুল ব্যাগ নামিয়ে রেখে আমিও দৌড়েছিলাম ওই দিকে। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে। এবং দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তায়। একটা লরিতে শোয়ানো ছিল মহানায়কের মৃতদেহ। ফুলে ঢাকা। মুখটা দেখা যাচ্ছিল। লরি যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, কারণ অগণিত ওই ভক্তরা উত্তমকুমারকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছেন, তাঁরা যাতে দেখতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছিল। এখনও মনে আছে ওই লরিতে শোকস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময়ের টলিগঞ্জের অনেন মহারথীরা। অনেকে হাঁটছিলেন লরির পাশাপাশি। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক মহিলা–পুরুষ ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন, এ আমার চাক্ষুষ দেখা। সত্যি বলতে কী, মনটা খারাপ হয়ে গেছিল আমারও।

উত্তমকুমার বোধহয় একজনই হয়। এখনও যখন টিভিতে একশোবার দেখা কোনও পুরনো উত্তমকুমারে সিনেমা দেখি, তখন আবার বসে পড়ি টিভি-র সামনে। আবক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার অভিনয়ের দিকে।

আমরা যারা সত্তরের দশকে বড় হয়েছি, তারা উত্তমকুমারকে কখনও ভুলতে পারেনি। এখনও কোনও কোনও নতুন ছবি সিনেমার পর্দায় দেখলে হঠাৎ করে মনে হয়, ইসস এই রোলটা যদি উত্তমকুমার করতেন, তা হলে সিনেমাটার চরিত্রই বদলে যেত।

জানি না, আমাদের পরের জেনারেশনের এ রকম মনে হয় কি না। নিশ্চয় হয়। জেনারেশন পাল্টায়, কিন্তু উত্তমকুমার জেনারেশন গ্যাপ ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য একটা ফেনোমেনন। সেটা বোধ হয় আর কারও ক্ষেত্রে এখনও হবে না। ❖

ইণ্ডিয়ান সিল্ক মিউজিয়াম
Indian Silk Museum

47A , Gariahat Road, (Gariahat Junction) Kolkata - 700019, Phone - 2463 9465

সগৌরবে চলছে

POSSE-SHIB ENTERTAINMENT HOUSE

পসে-শিব এন্টারটেইনমেন্ট এর নিবেদন

অর্ক বসু প্রযোজিত

শিব নারায়ণ বসু নিবেদিত

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : রূপক মজুমদার

KIDNAPAR

সংগীত : রাজা নারায়ণ দেব

চিত্রগ্রহণ : প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী

কার্যনির্বাহী প্রযোজনা : সৌনাভ সেনগুপ্ত

সম্পাদনা : সুজয় দত্ত রায়

Music Channel Partner DHOOM

Audio On DHOOM

Distribution Partner PIYALI FILMS

Telecom Partner MTS

Radio Partner FEVER 104 FM

Marcom Partner FAME PER SECOND